২য় বর্ষ।

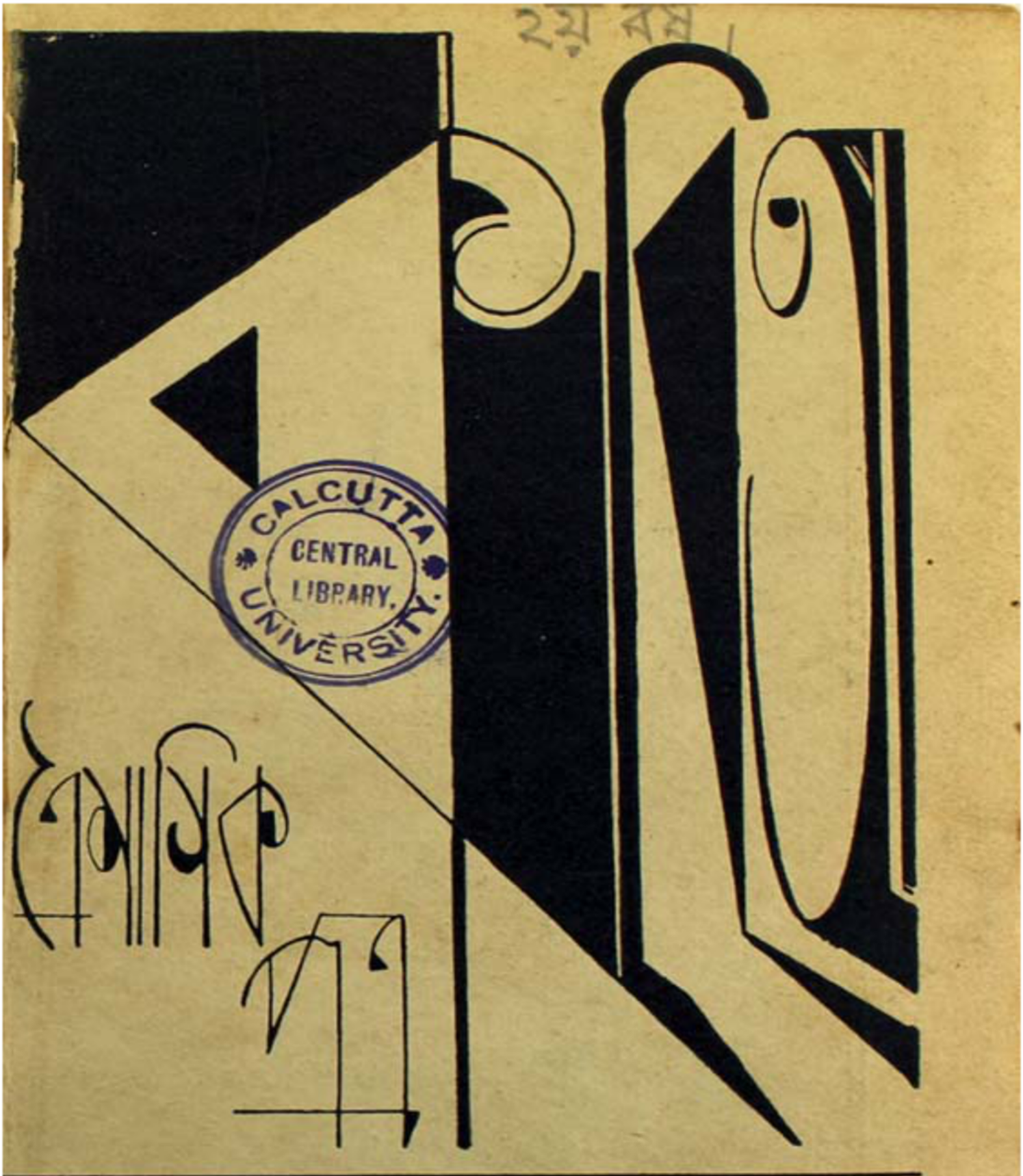

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন,
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, মোহিত দাশগুপ্ত, কিরণশঙ্কর
সেনগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, যুবনাশ্ব,
দ্বিজেন্দ্র মৈত্র, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়,

রবীন্দ্রনাথের নতুন বই, জি, কে, চেস্‌টারটন, বাঙলা ছন্দ

বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা

আশ্বিন
১৩৪৩

প্রতি সংখ্যা ছয় আনা

23,247.

প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রণীত
প্রথমা
দাম দেড় টাকা।

বিষ্ণু দে
প্রণীত
উর্ব্বশী ও আর্টেমিস
দাম এক টাকা

বুদ্ধদেব বসু
প্রণীত
বন্দীর বন্দনা
দাম দুই টাকা।

বুদ্ধদেব বসু
প্রণীত
পৃথিবীর পথে
দাম এক টাকা।

শ্রেষ্ঠ আধুনিক কাব্য
সকল প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : প্রেমেন্দ্র মিত্র : সহকারী সম্পাদক : সমর সেন

আশ্বিনিক সূচীপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ : আশ্বিন, ১৩৪৩—আষাঢ় ১৩৪৪

[শেষের সংখ্যা পৃষ্ঠাসূচক]

অজিত দত্ত

বাড়া সন্ধ্যা,	চৈত্র,	৩৬

অন্নদাশঙ্কর গুপ্ত

মুক্তি না মৃত্যু,	চৈত্র,	৩১

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কল্পনা,	চৈত্র,	৩৫

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

পত্র,	আশ্বিন,	৩০
দৃষ্টান্ত,		৩১

ছায়া দেবী

অনন্ত,	আষাঢ়,	৩৯

জীবনানন্দ দাশ

নয় নির্জন হাত,	আশ্বিন,	১১
শিকার	"	১৪
"বলিল অশথ সেই"	"	১৭
নদী	"	১৯
হাজার বছর শুধু খেলা করে	"	২০
সিন্ধুসারস	পৌষ,	১৩
রাত্রিমাখা ঘাসে	"	১৭
স্বপ্ন	"	১৯
হরিণেরা	"	২০

জীবনানন্দ দাশ

শ্রাবণরাত্রি	চৈত্র,	২৩
হিজল	-	২৪
আদিম মেঘমালা	আষাঢ়.	১৭
মুহূর্ত	-	১৯

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

আমার এ রাত ও সময়	আশ্বিন,	২৩
শুধার গান	চৈত্র,	৫
জাতক	-	৭
সনেট	-	১১
বিকাশী	আষাঢ়,	৪১
চৈত্র-চুর্বি	-	৪৪

দিজেন্দ্র মৈত্র

বিম্বন	আশ্বিন,	৪২
একটি সূর্যাস্ত	পৌষ,	২৯
তাজমহল	-	৩০
সূর্যমুখী	আষাঢ়,	৩১
বাঁশী	-	৩২

নতুন কবিতা (সমালোচনা)

আশ্বিন,	৪৮	পৌষ,	৪০

প্রতিভা বসু

বিরহ	পৌষ,	২৬
পরিচ্ছেদ	-	২৭

প্রভু গুহঠাকুরতা

প্রশ্নের উত্তর	পৌষ,	৪২

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রতিষ্ঠা	আষাঢ়,	২৩

বিষ্ণু দে

প্রার্থনা	আশ্বিন,	৩৫
যযাতি	পৌষ,	৩২

ভি, এইচ্ লরেন্সের কয়েকটি অনুবাদ চৈত্র, ১২

টিকা-টুর্বি	আষাঢ়,	৪

বুদ্ধদেব বসু		
সময় নেই	আশ্বিন,	৪
গানের মধ্যে গান	"	৬
তুমি যখন চুল খুলে দাও	"	১০
মূল	পৌষ,	৩৩
ব্রাউনিঙের অনুসরণে	"	৩৪
নাম	"	৩৬
কার্তিক	"	৩৮
ইকনমিক্স	চৈত্র,	১
এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে	আষাঢ়,	৪৯
বিভূতিকুমার বসু		
পাহাড়ের রহস্য	আষাঢ়,	২০
মোহিত লাহিড়ী		
আত্ম-ইতিহাস	আশ্বিন,	২৬
মুকুলনাথ		
ইস্টের ক্লাস	আশ্বিন,	৩৭
একটি কথা	"	৪০
শীতলপাটি	চৈত্র,	২৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
স্বপ্ন	আশ্বিন,	১
মুক্তপথে	পৌষ,	১
গদ্যছন্দ (প্রবন্ধ)	"	৪৬
স্মরণ	আষাঢ়,	১
লীলাময় রায়		
চিঠি-পত্র	চৈত্র,	৬২
লীলাময় বসু		
ঘন	আষাঢ়,	২৭
শিবরু সেন		
অভিবর্ণ	আশ্বিন,	২১
বসন্ত	"	২২
মরুভূমিতে মৃত্যু	পৌষ,	২১
বসন্তের গান	চৈত্র,	৩৭
অখ্যাত নায়ক	আষাঢ়,	৪৮

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ		
জি. কে. চেস্টার্টন	আশ্বিন,	৫১
দুই ও তিন	-	৫৩
প্রকৃতির কবি	চৈত্র,	৩৯
নবযৌবনের কবিতা	আষাঢ়,	৫১
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত		
বাহান্ন	আশ্বিন,	৩২
সমাপ্তি	পৌষ,	৩৯
অকৃতজ্ঞ	চৈত্র,	২৬
প্রার্থনা	আষাঢ়,	৩৪
সুরেশর শর্মা		
প্রশস্তি	চৈত্র,	৩০
সুশীলকুমার ঘোষ		
মনুমেণ্ট	আষাঢ়,	২৯
সুস্তিশেখর উপাধ্যায়		
কবিতা	আশ্বিন,	৪৩
গান	-	৪৬
হাউই	পৌষ,	৪১
হেমচন্দ্র বাগচী		
গীতিগুচ্ছ	পৌষ,	৪
নির্জন অলস মধ্যাহ্নের সুর	চৈত্র,	১৯
নবজন্ম	আষাঢ়,	১০
"স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু"	"	১২
প্রলাপ	-	১৪
মেঘদূত ও চাঁদ	-	১৬

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

কবিতা

দ্বিতীয় বর্ষ আশ্বিন, ১৩৪৩ প্রথম সংখ্যা

স্বপ্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘন অন্ধকার রাত,
বাদলের হাওয়া
এলোমেলো ঝাপট দিচ্ছে চারদিকে।
মেঘ ডাকছে গুরুগুরু,
থরথর্ করছে দরজা,
খড়খড় করে উঠছে জানলাগুলো।
বাইরে চেয়ে দেখি
সার-বাঁধা সুপুরি নারকেলের গাছ
অস্থির হয়ে দিচ্ছে মাথা ঝাঁকানি।
দুলে উঠছে কাঁঠাল গাছের ঘন ডালে
অন্ধকারের পিণ্ডগুলো
যেন পাকানো প্রেতের মতো।
হাতায় থেকে পড়েছে আলোর রেখা
পুকুরের কোণে
সাপ খেলানো ঝাঁকাবাঁকা।

মনে পড়ছে ঐ পদটা—

"রজনী সাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
...কদম ফুলিছ হেনকালে।"

সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসায় ঝুঁকিয়ে তার মন,
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল-পরা,
ঘাটের থেকে নীলশাড়ি
নিংড়ে নিংড়ে চলা।

আজ এই কোড়ো রাতে
তাকে মনে আনতে চাই,
তার সকালে তার সাঁঝে,
তার ভাষায়, তার ভাবনায়,
তার চোখের চাহনিতে,
তিনশো বছরের আগেকার
কবির জানা সেই বাঙালির মেয়েকে।

দেখতে পাইনে স্পষ্ট ক'রে।
আজ সে পড়েছে ঘাসের শিছনের ছায়ায়
তারা সাড়ির আঁচল যেমন ক'রে বাঁধে
কাঁধের পরে,
খোঁপা যেমন ক'রে ঘুরিয়ে থাকায়
পিছনে নেমে-পড়া,
মুখের দিকে যেমন ক'রে চায় স্নিগ্ধচোখে
তেমন ছবিটি ছিল না
সেই তিনশো বছর আগেকার কবির সামনে।
তবু—"রজনী সাঙন ঘন
...স্বপন দেখিনু হেনকালে।"—
শ্রাবণের রাত্রে এমনি ক'রেই বলেছে সেদিন
বাদলের হাওয়া,
মিল রয়ে গেছে
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

৩০ মে, ১৯৩৬
শান্তিনিকেতন

সময় নেই

বুদ্ধদেব বসু

আমি অপেক্ষা করতে পারতুম তোমার জন্য :
তরোয়ালের মত দীর্ঘ দীর্ঘ দিন :
তালে আর পাতায় আর হাজার অদৃশ্য পাখির উপনিবেশে মর্মরিত
গানের মত রাত্রি ;
আমি অপেক্ষা করতে পারতুম গভীর পর গভীর আবর্তনে,
রামধনু-রঙিন বছরগুলির চিরপূর্ণিমান চাকার ছিতর দিয়ে ;
সূর্য যখন দক্ষিণে আর দিন ছোট, আমি মুগছি তন্দ্রার মধ্যে তোমার
কথা ভাবতুম ।
সূর্য যখন উত্তরে, আমি সূর্যাস্তের আকাশের দিকে উড়িয়ে দিতুম
আমার ভাবনাগুলি
সাদা পায়রার ঝাঁকের মত—
তাদের ডানায় হাওয়া কবিতার সুর ।

তবুনি ক'রে একদিন মিলনের সময় আসতো ।
তোমার চুলের গন্ধ দুরন্ত বৈতসি হাওয়ার মত আছাড় খেয়ে পড়তো বুকের উপর,
আর আমার গানের গুরুন পূর্ণিমার চাঁদ হ'য়ে উঠতো
তোমার চিরন্তন মুখের উপর স্তব্ধ ।

কিন্তু সময় নেই।
রাতের পর রাত চাঁদ কৃশ হ'য়ে আসে, চাঁদ ক'মে যায়; আর আমরা
আমরাও ক'মে যাই প্রতিদিনের, প্রতিরাত্রির খাঁচায়:
আজ কৃষ্ণপক্ষের রাত, চাঁদ মেরি ক'রে উঠবে; অন্ধকার আকাশে
তারাগুলি বিরহের অশ্রুর মত:
কিন্তু আমি জানি একদিন পশ্চিমের আকাশে তাকিয়ে আবার দেখবো
নতুন চাঁদের জলন্ত শিখা; চাঁদ ফিরে আসবে, চাঁদ আবার ভ'রে উঠবে,
সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা নতুন, অপরূপ তার উন্মীলন:
কিন্তু আমরা জ্ব'লে যাই মোমবাতির মত,
প্রাণের আগুনের ইন্ধন আমাদের শরীর.
আমরা জ্ব'লে যাই, নিবে যাই, নিঃশেষ হ'য়ে যাই,
কিছু থাকে না।

তাই এখন, সময় যখন আছে
আমি তোমাকে ডাকছি।
তোমাকে ডাকছি সময়ের সব গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে,
তার দু'দিক মৃত্যুর মেরাণ দিয়ে ঠাসা। মেরি কোরো না তুমি
আর মেরি কোরো না। যত সময় আমরা নষ্ট করবো লজ্জায়
আর অভিমানে আর ভাঙা-বকনায়
তার যোগাতা কি আছে মৃত্যুর? এমন উদ্‌ভৌকন তাকে মেরো
মৃত্যু কি এত বড় বন্ধু আমাদের?

গানের জন্যে গান

বুদ্ধদেব বসু

অনেক গান আমি গাই
তোমরা তা শুনে খুশি হও :
ঘরে আলো জ্বেলে, চারদিকে মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি,
গান শেষ ক'রে রানির মত আমি চ'লে যাই
স্তুতির তোরণের তলা দিয়ে।

আবার সে-সব গান তোমাদের, সকলের ; তা আমার মুখের মত
যা সবাই দেখতে পায় : তা অলঙ্কারের মত, যা আমাকে বাড়ায় ;
তা আমাকে বস্ত্র ক'রে তোলে, রানি ক'রে তোলে আমাকে—
আমাকে ঢেকে রাখে সেই সঙ্গে।

শিশু যেমন দু'হাতে জল নিয়ে ছড়ায়, তেমনি আমি ছড়িয়ে দিই সে-সব গান ;
ছড়িয়ে দিই, তারপর ভুলে যাই ; যেমন সুন্দরী তার অলঙ্কার খুলে রাখে
উৎসবের সন্ধ্যার শেষে—
তার মুক্তো আর প্রবাল আর চলটলে হীরের সব আলো—
যা দেখতে তোমরা ভালোবাসো, সে নিজে চাপা পড়ে যায় আড়ালে।

তাই যাত্র-রাতে সে যখন যায় তার আমীর কাছে
কেবল নিজেকে নিয়েই যায়
কেবল নিজেকে—
মুক্ত, নগ্ন, অপরূপ, অভূতপূর্ব সে নিজে।

আমারও একটি গান আছে
একটি গান,
যখন আলো নিবে যায় আর রাত বাড়ে, ঘরের মধ্যে আমি একা,
তখন গুন্‌গুন্‌ ক'রে তা গাইবো,
গুন্‌গুন্‌ ক'রে, নরম, ঘুমে-ভরা, স্বপ্নে-ভরা স্বরে,
অন্ধকার ভ'রে
সমস্ত রাত্রি ভ'রে—
আর সময় ব'য়ে যাবে দুপ্ত অদৃশ্য স্রোতে, বিশ্বের বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড থেকে
ঝ'রে-পড়া রক্তবিন্দু,
আমার গালের উপর দিয়ে নেমে-আসা অশ্রুর মত।

সে-গান আমার একলার, সে-গান আমার নিজের জন্য
আমার নিজেকে নিজে শোনানো,
সে-গান আমার নিজের সঙ্গে আমার কথা
রাত্রির অন্ধকারে, চুপে-চুপে।

অনেক গান আমি গাই,
তোমরা সে-সব শোনো, শুনে ভালো বলো :
কিন্তু একটি গান আছে যা তোমরা এখনো শোনোনি, কখনো শুনবে না,
তা নিঃশব্দে উঠে আসে আমার নিভৃত অন্ধকারের উৎস থেকে
যেমন রাত্রির হৃদয় থেকে উৎসারিত তারার ঝরনা :
রাত যখন বাড়ে, চারদিকে সব চুপচাপ, তখন সেই গানের সময়।
তখন সেই স্তব্ধতায় কলরোলে কোথায় ভেসে যায়
আমার সব গান, যা তোমরা শুনেছো।
ঢেউয়ের মতো তা আমাকে তুলে ধরে, আছাড় মেরে ফেলে মুহূর্তের
ওটরেখায়,
মৃত্যুর সীমানায় :
বুক ভেঙে যায় আমার
আমি ম'রে যাই।

কার জন্য সে-গান ?
আমার সে-গান কাকে শোনাবো ?
যে চায় তারই জন্য ; যে চাইতে পারে
তারই জন্য।

তোমরা, আমার গান শুনে যারা খুসি হ'লে
সেই গান কেউ শুনতে চাইলে না।

একদিন, একজন
কোনো একজন আসবে
তারও অন্তরে সেই নিঃশব্দ সুর-স্রোত
রাত্রির অন্ধকার থেকে নিঃসৃত :
রাত্রি তার বুকের মধ্যে, আর সেখানে
আমার গানের সুর জোনাকির সারির মত।
সে যখন কাছে আসবে, আমার সমস্ত শরীর গানের একটা ঢেউ হ'য়ে
উঠবে
ভেঙে পড়বে তার বুকের উপর,
ঝ'রে পড়বে, নিঃশব্দে, নিঃশেষে ঝ'রে পড়বে—
আচ্ছন্ন ক'রে
নিশ্চিহ্ন ক'রে
সমস্ত বিশাল রাত্রিকে বিচূর্ণ ক'রে
দুই আঙুলের মধ্যে চেপে-ধরা পাকা আঙুরের মত।

তুমি যখন চুল খুলে দাও

বুদ্ধদেব বসু

তুমি যখন চুল খুলে দাও
ভয়ে আমি কাঁপি।

তুমি যখন চুল খুলে দাও,
ভেসে আসে তোমার চুলের গন্ধ,
গুনগুন ক'রে গান করো তুমি,
ভয়ে আমার বুক কাঁপে।

গুনগুন ক'রে গান করো তুমি
আমার পাশে ব'সে :
তোমার মুখ দেখা যায় না,
বুকে এসে লাগে চুলের গন্ধ
ভয়ে আমার বুক কাঁপে।

তোমার মুখ ঝোলানো।
তোমার কালো চুল বেয়ে পড়ে,
তোমার কালো চুল বেয়ে ওঠে
আমার হৃদয় জড়িয়ে—
ভয়ে আমি মরি!

তুমি যখন চুল খুলে দাও
ভয়ে আমি কাঁপি।

মম নির্জ্জন হাত

জীবনানন্দ দাশ

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠছে :
আলোর হৃদয়ময়ী সহোদরার মত
এই অন্ধকার।

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে,
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
সেই নারীর মত
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে উঠছে।

মনে হয় কোন বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারত-সমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোন্ এক প্রাসাদ ছিল ;

মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ :
পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিল্ স্তম্ভের নিটোল মুক্তাপ্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এইসব ছিল সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক ;

অনেক কমলারঙের রোদ ছিল,
অনেক কমলারঙের রোদ ;

আর তুমি ছিলে।
তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখিনা,
বুঝিনা।

কাস্তনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ বিদায় ও সমুদ্রের বেদনাময় রেখা,

সুপ্ত বাদুড়ের গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ঘুসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের আনাচ,
মধুরের শেখমের মত রঙীন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
কল্পিত আভাস,—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময় !

পর্দায়, পালিচায় রক্তাক্ত রৌদ্রের বিস্তৃরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ :
তোমার নগ্ন নির্জন হাত ;

তোমার নগ্ন নির্জন হাত ।

শিকার

জীবনানন্দ দাশ

ভোর—
আকাশের চুং খাসকক্সিওর মেয়ের মত কোমল-নীল ;
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মত সবুজ।
একটি তারা এখনও আকাশে র'য়েছে :
শাঙ্খাপাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলি-মণির মেয়েটির মত ;
কিংবা মিশরের মাদ্রধী তার বুকের থেকে যে মুক্তা আমার নীল মনের
গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে একলাভে—তেমি—
তেমি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও।

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা সারারাত মাঠে
আগুন জ্বেলেছে,—
মোরগফুলের মত লাল আগুন ;
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের ;

সূর্য্যের আলোয় তার রং ফুলুমের মত নেই আর ;
হ'য়ে গেছে রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মত ।
সকালের আলোয় টল্‌মল্ বিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ মধুরের
সবুজনীল তারার মত ঝিল্‌মিল্ করছে ।

ভোর ;
সারারাত চিন্তাবাহিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মত অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে
ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা ক'রছিল ।

এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে ;
কচি বাতাবীলেবুর মত সবুজ ঘুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নাহল—
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মত একটা আবেগ দেওয়ার
জন্য
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত ডানা ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মত একটা বিস্তীর্ণ
উল্লাস পাবার জন্য ;
এই নীল আকাশের নীচে সূর্য্যের সোনার বর্শার মত জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্য্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য ।

একটা অদ্ভুত গন্ধ।
নদীর জল মহুয়াফুলের পাপড়ির মত লাল।
আগুন জ্বলে আবার,—উনি লাল হরিণের মাংস তৈরি হ'য়ে এল।
নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় ব'সে অনেক পুরানো শিশিরভেজা গল্প;
সিগারেটের খোঁয়া;
চৌকিদারটা কয়েকটা মানুষের মাথা;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক,—হিম—নিঃশব্দ নিরুপদ্রব ঘুম।

'বলিল অশথ নেই'

জীবনানন্দ দাশ

বলিল অশথ ধীরে : কোন্ দিকে যাবে বল—তোমরা কোথায় যেতে চাও ?
এতদিন পাশাপাশি ছিলে আহা, ছিলে কত কাছে ;
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো আজো তো দাঁড়ায়ে তারা আছে ।
এই সব স্নেহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন্ দিকে কোন্ পথে ফের
তোমরা যেতেছ চ'লে পাইনাক' টের !
বোঁচকা বেঁধেছ ঢের,—তোল নাই তাতা বাটি ফুটা ঘটিটাও ;
আবার কোথায় যেতে চাও ?

পঞ্চাশ বছরও হায় হয়নিক',—এই তো সেদিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়
আজো আহা, তাহাদের কথা মনে হয় !—
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এই সব ঘাস ধান নিম আমফলে
জীবনের শান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনায় শুধেছিল ঋণ ;
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে,—মনে হয় যেন সেই দিন !

এখানে তোমরা তবু থাকিবে না যাবে চ'লে তবে কোন্ পথে ?
সেই পথে আরো নাড়ি—আরো বুঝি সাধ ?
আরো বুঝি জীবনের গভীর আষাঢ় ?
তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে রবে আকাঙ্ক্ষার ঘর !...
যেখানেই যাও চ'লে হবে নাকো' জীবনের কোনো অপচয় ;
এক ক্ষুধা এক ঘর এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
ম্লান ছুঁয়ে দেখা দেবে সেখানেই বাঁধ গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর !
বসিল অশথ সেই ন'ড়ে ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর ।

নদী

জীবনানন্দ দাশ

ধইঞ্চির ক্ষেত শুধু—শাইবাবলার কাড়—আর জাম হিজলের বন,—
কোথাও অর্জুন গাছ—তাহার সমস্ত ছায়া একের নিকটে টেনে নিয়ে
কোন্ কথা সারাদিন কহিতেছে অই নদী ?—এ নদী কে ?—ইহার জীবন

হৃদয়ে চমক আনে ;—যেখানে মানুষ নাই—নদী শুধু—সেইখানে গিয়ে
শব্দ শুনি তাই আমি ,—আমি শুনি—দুপুরের জলপিপি শুনেছে এমন
এই শব্দ কত দিন ;—আমিও শুনেছি ঢের বটের পাতার শব্দ দিয়ে

হেঁটে যেতে—ঘাসা পেয়ে ; দুপুরে জলের গন্ধে একবার স্তব্ধ হয় মন ;
মনে হয় কোন্ শিশু ম'রে গেছে,—আমারি হৃদয় যেন ছিল শিশু সেই ;
আলো আর আকাশের থেকে নদী যতখানি আশা করে—আমিও তেমন

একদিন করিনি কি ? শুধু একদিন তবু ? কারা এসে ব'লে গেল,
'নেই—
গাছ নেই—রোদ নেই—মেঘ নেই—তারা নেই—আকাশ তোমার
তবে নয় !'—
হাজার বছর ধ'রে নদী তবু পায় কেন এই সব ? শিশুর প্রাণেই

নদী কেন বেঁচে থাকে ?—একদিন এই নদী শব্দ ক'রে হৃদয়ে বিস্ময়
আনিতে পারে না আর ;—মানুষের মন থেকে নদীরা হারায়,—সেই হয়।

হাজার বছর শুধু খেলা করে

জীবনানন্দ দাশ

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকীর মত :
চারিদিকে পিরামিড,—কাফনের ঘ্রাণ ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না,—খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ ধামের মত : এশিরিয় ;—দাঁড়ায়ে র'য়েছে যূপ, ম্লান ।
শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের,—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেন্‌দেন্ ;
'মনে আছে ?' শুধাল সে—শুধালাম আমি শুধু, 'মনস্তত্ত্ব সেন ?'

অগ্নিবর্ষ

সমর সেন

রাত্রির দিগন্তে ঘুরে ফেরে
আদিম জন্তুর মতো বিরাট মেঘ ;
সে মেঘে পাহাড় আর আকাশ হলো ধূসর গম্ভীর,
আর এতোদিন পরে আজ মৃত্যু কি এলো,
হে অগ্নিবর্ষ !
নির্জন গুহার নিবিড়, নিষিক্ত প্রেম,
ভিজে ফুলের মতো নগ্ন কীর নরম শরীর,
প্রতীক্ষায় কম্পমান কতো ক্ষীত উজ্জ্বল বুক,
তবু আজ মৃত্যু এলো আষাঢ়ের মেঘের মতো,
হে অগ্নিবর্ষ !

23,297

বসন্ত

সমর সেন

পাইন বনে মর্মর ধ্বনি,
এখনি সন্ধ্যা নামবে দিগন্তে
লাল মেঘের বন্যায়,
তারপর রাত্রি ভ'রে ট্র্যাজিক পুলিশের নিঃশব্দতা,
আর রাত্রির অরণ্যে
কতো পুরোনো স্মৃতির তীক্ষ্ণ দাঁত।

আমাদের রক্তে আজ
কতো পুরোনো স্মৃতির বিষাক্ত সাপ,
বিগত কতো বসন্তের উপবাসী
বিশাল অজগর ;
আর আমাদের উপরে আজ উজ্জ্বল অপরূপ আকাশ,
সামনে লাল পাথরের স্নিগ্ধ পথ,
দূরে মেঘের ছায়া পড়ল সবুজ, গম্ভীর পাহাড়ে।

আবার এ রাত্ত ও ভ্রমর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

১

আমার এ রাত্ত ও ভ্রমর।
মৃত্যুচ্যুত অন্ধকার
মধুগর্ভ হৃদ তার
কামনায় ডাকে।
দুষ্প্রেক্ষ্য চোখের আলো নিবাও ভ্রমর।
তারাদের বিন্দু বিন্দু প্রেমের আভাস
ভরেছে আকাশ।
জীবনের সৌরভগুলি,
কী দুষ্প্রেক্ষ্য চোখ!
তোমার ও গুঞ্জনের ঘূর্ণি
ঢাকুক তাদের
মেঘাক্রান্ত কৃষ্ণপক্ষ নিস্তাক সে মোক।

২

অনুবীক্ষণই যদি
মেলে দাও চোখে,
অতীতের ক্ষীণ প্রাণ
যদি দেয় ধরা
নিশ্চিত্র ভিতের যুগে
পাতার কঙ্কাল হবে সাথী।
তবু এ ক্লান্তির পরিণয়
ফোটাবে কি ফুল—
ধরাবে কি ফল ?
জীবনের পশ্চিমে প্রদোষ
উড়াবে ক্লান্তির ধূলি
ছায়া হবে দীর্ঘতর
অস্তলোক পানে।

৩

পশ্চিমের যৌত্রছুর্গে
ছিন্ন ভিন্ন প্রাণের সাগর,
প্রজ্ঞা-শিখরে নামে ক্রোধ।

বন্ধক মানুষ ঘরে স্বপ্নের চালে
ক্ষুধার্ত্ত সে স্বপ্ন-খাদক।
ঊর্ত্তমূল প্রকৃতির অসংখ্য শিকড়
আকাশের জন্যে শ্বাসরোধ।
তবু আসে রৌদ্রচূর্ণ-সোনালী বিকাল
আর আসে স্বপ্নদূত-প্রদাহী নায়ক।
আছে দেরী কত দিন—
আর দেরী কত দূরে প্রয়াণের বৈতরণী তীর?
নাস্তিকের স্বীকৃতির ফাঁক আজো নীল
নৃসিংহ-নখর বহুদূরে।

আত্ম-ইতিহাস

মোহিত দাশগুপ্ত

আমার ভাবনা-রশ্মি
তাকে স্পর্শ করছে—
প্রতি মুহূর্তে
আমার মন থেকে যে-ভাবনা স্রোত ছুটে চলেছে
দিকে দিকে,
সময় ও স্থানের যুক্ততাকে
উল্লঙ্ঘন ক'রে,
আর বহু জিনিষ ও ঘটনার সঙ্গে
চিন্তার অসংখ্য সূত্রে
আমাকে যুক্ত করছে,
তারই মাঝে ওর অস্তিত্ব
নিবিড়ভাবে
আমাকে স্পর্শ করে।

বেহালার তার থেকে সুরের ফুল্‌কী ঝরে ঝরে
যেমন চারিপাশে আকাশে ওড়ে
আর ঝলমল করে
তেমনি ভাবনার গ্রন্থিগুলো
হঠাৎ কেমন কাঁপতে থাকে।
আর
তা থেকে ছিটকে পড়ে
অতীতের মুহূর্তগুলো,
মুক্তি পায় আমাদের আত্মার প্রেতদল
বিস্মৃতির বন্ধন থেকে :
কবিতের আলোকসম্পাতে পাঠ করি—
অতীতের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন
আত্ম-ইতিহাস।

বহুযুগ আগের অ্যানথ্রপয়েড্ থেকে
আধুনিক মানুষের মাঝেকার
অসংখ্য জীব-স্তরে
যে-ভাবনা আমাদের ব্যর্থ হ'ল,

যে-আনন্দ
অনন্ত অনুভূতিতে স্পন্দিত হ'য়েছিল
চাঁদের মত
বুদ্ধির বহু ঊর্দ্ধে,
যে-মহত্ত্ব আমাদের মনকে
উদ্বেলিত করেছে
বেদনায় ও বিস্ময়ে—
কালের সীমাহীন আকাশে
হঠাৎ দেখতে পাই
তাদের সমারোহ চলেছে
আমাদের সত্তাকে বেষ্টন ক'রে।
আমার ভাবনায়-ভাবনায়
তাদের প্রতিচ্ছবি জেগে ওঠে—
এক মুহূর্ত্ত :
তারপর কোথায় সব অদৃশ্য, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল,
অজ্ঞতা ও অবোধ্যতা
ঘিরে ফেলে আমায়।

আমার
শুধু নির্বাক বেদনায়
ঘুমুতে পারি
তারই সঙ্গে আমি বাঁধা,
যুগ-যুগ থেকে :
কিন্তু কোথায় সে বন্ধন-রজ্জু
যা ধ'রে আমরা
দু'জনা দু'জনার
কাছে এগিয়ে যেতে পারি ?

অন্তরালের যৌবন-ব্যাপী নিকল ঘুলচে আমাদের মাঝে ।

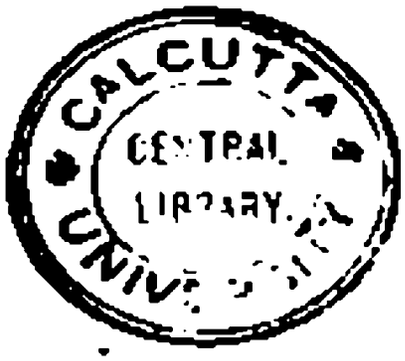

শত্রু

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সে বছরের সেরা ছাত্র মহীতোষ রায়
শত্রু হ'লো সেদিন থেকে :
আমার সোভনাকে ছিনিয়ে নেবার দিন।
ছাদে কাটতো পরমের সন্ধ্যা, আর
পড়ার ঘরে বর্ষার বেলা,
তখন মহীতোষ তো ছিলো বন্ধুমাত্র।

আমাকে আর শাস্তি দেবে না মহীতোষ :
বিদেশে আছি, তার মারা যাবার
কী দরকার ছিলো ? আমার নিশ্বাস তার
ক্ষতি করেনি তো কোনো।

হঠাৎ ব্যথা অনুভব ক'রলুম বুকে—
শীতের দেশে বরফের রাস্তা দিয়ে
হেঁটে যাওয়ার মতো :

এতোদিন শত্রু ছিলো শুধু মহীতোষ
এখন সোভনাও তো।

দৃষ্টান্ত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দেয়ালের কোটরে
আমার টেবিলের মাথার উপর
কয়েকটা চড়ুই বেঁধেছে বাসা।
কাজ করা অসম্ভব :
তাদের তীব্র কিচকিচ শব্দ
ভালো লাগে, অথচ ভালো নয়।

ঘুমের আমার অবস্থা বোঝে নাকি ?
ভেঙে দিতে চায়
পাখীদের বাসাটা ;
হাতে ধ'রে আস্তে বাধা দিই তাকে,
এরা তো আমাদের দৃষ্টান্ত।

বাতায়ন

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মৃতকল্প প্রবাসক বক্ষবর্মে সহসা শিহরণ,
আতুরালয়ের ঘরে আজি তার বিষমিষা জাগে ;
তিমিরদাল বিগ্রহের নিরাগ্রহ, অনির্বাণ ঘুণ
বিমুখ করেছে তারে, অন্তরাত্মা জেগেছে বিরাগে ।

ক্ষীরসাগ অস্থি-মজ্জা, হিমসাগ মেদ-মাংস বহি
স্বর্ণপ্রভ জানালায় কায়ক্লেশে সে এসে দাঁড়ায়,
কাচের কবাটে দেখা বাধা পেয়ে সবিস্ময় বিরহী
প্রস্তরিত রাজপথে পদচিহ্ন এঁকে চ'লে যায় ।

গৃধ্র নীলাকাশসম জরদ্গব ওষ্ঠাধরে তাই
স্নেহের কদম্ব দেশে স্ফটিকের ফল্গু বাতায়নে
সে ভাবে ফুমায়ী প্রিয়া আজো বুঝি তারে ভুলে নাই,
সে-প্রাক্তন মধুকোষ মুক্তরিবে তাহারি চুম্বনে ।

যদাবিল মন তার ভবিতব্য অমনি পাথরে—
অধ্যায়, অনন্ত আর্ত্তি, কালক্ষেপ, আয়তির ব্রত।
দেখে সে উদাও চোখে নগরের রক্তিত শিখরে
দ্বিজকণ্ঠ সায়াহ্নের রক্তস্রোত ছুটে অবারিত।

চাহে সে দিগন্তপটে, সুরভির নীলাকাশ নদে
সোনার মধুপর্ণী ছুপ্ত যেথা রাজহংসসম।
উর্ণিল বেপথু লাগে মাঝে মাঝে সে-বক্ষ সম্পদে;
স্মৃতির প্রসাদ পেয়ে অবসাদ হয় নিরুপম।

আমিও তেমনিতর ক্ষুব্ধপ্রাণ সংসার-বিবাগী
সুখের নিষ্প্রাণ পথে কৃষ্টিবৃত্তি করি না সন্ধান।
শুদ্ধজীবী সন্তানের অন্নজীবী জননীর লাগি
সে-মমতা নিকষনে আমি আর নহি সাবধান।

আমিও পলায়ে বাঁচি; সেইমতো জীবনবিমুখ
আমিও তাকায়ে থাকি নির্নিমেষে কাচের কবাটে;
সুবর্ণ শিশিরসিক্ত উষসীর অমলিন মুখ
আমাকেও ডাক দেয় অসীমের অর্গলিত ঘাটে।

সে-মায়ামুহূর্তে আমি ইচ্ছামৃত্যু, স্বয়ম্ভু দেবতা,
রূপদক্ষ বিশ্বকর্মা, অস্তিত্বের সহজ সাধক ;
নিষিদ্ধ স্বর্গের ছুঁয়ে প্রস্ফুটিত মোর কল্পলতা ;
অধ্যাত্মের অভিষেকে আমি সেবা সর্বদম্পাদক ॥

কিন্তু মোহ মুহূর্তের ! মর্ত্যাই বিজয়ী হয় শেষে :
এ-নিশ্চিন্ত আশ্রয়েও পশে আসি সংক্রমণ তার,
অন্তরে বিতৃষ্ণা জাগে, নীলিমার শুভ্র নিরুদ্দেশে
পুঞ্জ হয় সংসারের পার্থিবিক দুর্গন্ধ উদ্গার ॥

হায় রে সন্তপ্ত আত্মা, উদ্ধারের এই কি উপায়—
পিশাচের অপহরে বৈধী মায়া অন্ধ রোষে হানা,
কালের অপরাধ বক্ষে ভুলে থাকা ত্রিশঙ্কুর প্রায়,
শূন্যে উদ্ধাবন করা বিস্তারিয়া পর্বহীন ডানা ?

(Stéphane Mallarmé-র Les Fenêtres কবিতার অনুবাদ)

প্রার্থনা

বিষ্ণু দে

পাখীর আবেগ জাগাবে শরীর মনে ?
পাখার কাপট দিনরাত যাব শুনে ?
পাখার ছন্দ হৃদয়ের দেবে বেঁধে
হর্ষবিহারে দূরদিগন্তকোণে ?

নগরের ভিড়, ব্যর্থ দিনের জ্বালা !
অসহায় ভীরু ? শুধু তার পথে চলা ?
বন্ধুর ক্রূর-ও কুটিল—ক্ষণের ভীতি ?
অগণন লোক—তবু জলা, শুধু জলা !

প্রশ্নলোকের পরিক্রমা তো শেষ !
শিল্পীজনের মিতালিতে দিই শিষ্ !
নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি অপলক !
দুপাশে মনার ক্লান্তির মেঘাবেশ ।

দিশাহারা চোখ, চরণ শ্রান্তিহীন—
স্থিতি চাই নে কো,
শুধু বর দাও দেব !

উর্দ্ধলোকের উদ্ধতগতি হাও
দুর্যারদুর্দ্ধ চুক্কার চুক্কার ঘোরা
স্বচ্ছন্দতল হাল্কা হাওয়ার ঘোরা !
কাটুক্ আমার জীবনযাপনে সেতুবন্ধনী দিন।

হে মেরুচারিণী তোমার চোখের নীল
ইস্পাতে আজ ফলদি' উটুক্
কঠিন দীর্ঘ খড়্গোদ্যত দিন
উর্দ্ধলোকের উদ্ধতগতি চরণ শ্রান্তিহীন।

ইন্টের ক্লাস

সুবলাশ্ব

ছাড়লো গাড়ী জলিঙ্গি ষ্টেশন থেকে।
যাত্রু, বৌচকা, প্রসাদ ও পেঁড়ার পুটলী,
ও 'পালে'র যাত্রী সপরিবারে মালবাবু, তারবাবু
ও টালিবাবুর বে-পরোয়া গার্হস্থ্য-বিস্তার অতিক্রম ক'রে
কোনোমতে ঠাঁই নিলেম দুজনে,
ইন্টের ক্লাসের অপরিসর অভ্যন্তরে।

লাদে কন্যাপাত্রের হাফ-ঘোমটা সরিয়ে
মাল-বৌদি উভাক্ত বিরক্তিতে গুঁজলেন গালে
দোক্তা-পানের খিলি।
টালি-বৌঠান,
ব্যালয়দার মালিশের তৈলাক্ত আদিঅন্ত-শিশু
নবম ও কনিষ্ঠ সন্তানের নগ্ন গাত্রে
দিলেন টেনে কাঁথার ঢোপা।
তারবাবু হঠাৎ উঠে প্রাণান্ত কাসির বেগ রোধ ক'রে,
ঠুকলেন বেসালাই আধপোড়া বিড়ির প্রান্তে।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে
তুমি বসলে বেঞ্চির একধারে,
আমি মেঝেয়।
সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে যায়।
সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে যায়
মহুয়া বনের পাশ দিয়ে,
ফুটন্ত পলাশরাগে আগুন-লাগা দিগন্ত বেয়ে।
জানালা দিয়ে চোখে পড়ে
চষা, রুক্ষ ক্ষেতের গোলকধাঁধাঁ,
আর পলায়মান পাহাড়ের সার,—
আসন্ন অন্ধকারের আবির্ভাবে ভীত।

অচঞ্চল আকাশের নরম নীল
গাঢ়তর হ'য়ে ওঠে রাত্রির অঞ্চল-সঞ্চালনে।
হাজারো তারার মিছিল চলে সার বেঁধে মাথার ওপর,
ভেতরে চলে রেলবাবুদের অব্যাহত শান্তিপর্ব,
ঘূর্ণায়মান ভূলোক চলে সাথে-সাথে
সশব্দনে ছুটে চলে রেলগাড়ী।

ধীরে, তোমার মাথা চ'লে পড়ে জানালার কাছে ;
ঘুমের মুহূর্ত আনন্ত বিষণ্ণ মুখে আনে স্বপ্নের সম্মোহ ।
প্রশ্বাস-ক্ষীত নাসাগ্রে
অর্ধস্ফুট ওষ্ঠ-প্রান্তে
ক্লান্ত চোখের কোল বেয়ে জাগে অতৃপ্তির রেখা ।
সে কি আত্মবঞ্চনার ?
তোমার মনমানসে জাগে কিসের কোলাহল ?
তুমি শিউরে ওঠো !

আমার বুকের দুরদুরুতে
জাগে
দুঃসহ দুরন্ত দুরাশার দুঃস্বপ্ন ।
প্রতি পেশীতে প্রাক্তন পাশব প্রয়োচন ।
ধমনীতে জ্বলে তপ্ত রক্তের প্রদাহ ।

জাগে মহাকাল,
যেমন জেগেছিল অহল্যাসঙ্গ বাসবের
বিষাদ-বিস্ময়ের মুহূর্তে ।

আর জাগে
নিদ্রিত তারাবাবুর স্ফটিকবিনির্মিত সকল চোখই
বীভৎস কপট কৌতূহলে ।

একটি কথা

সুধনাথ

কতোদিন গিয়েছি তোমার কাছে
একটি কথা বলবো ব'লে।
কথার ওপর কথা গেঁথে
কতো হাজার কথা ব'লে এলাম,
কিন্তু সেই একটি কথা বলা হোলো না।
কথার বনে হারিয়ে গেলো আমার প্রাণের কথা,
খুঁজে-খুঁজে খেইহারা পাগলের মতো ঘোরা
আজো শেষ হয়নি।
দিনের হাবভাব
নিভে গেল কতো সন্ধ্যার শোণিতাভলিপ্তে।
অবাকুসুমসভাসের
প্রাত্যহিক প্রকাশে পরিসমাপ্ত হোলো
কতো রাত্রির প্রেতোৎসব।
সৌরচক্রচারী কতো লক্ষ গ্রহনক্ষত্রের
কক্ষচ্যুত বিশৃঙ্খলা
নিঃসেষ হোলো আত্মঘাতী উল্কাপাতে।
কতো প্রাণস্পন্দ পরশ পাষাণে পর্যবসিত হোলো চন্দ্রলোকে।

বহুজনাকে বেষ্টন ক'রে রক্তালাহিত অনুবি
আহ্বানে সঞ্চলো সততা আকৃতিতে,—
বেদমৌনী মৌনী হিমাদ্রির সমাধিসর্বস্ব মন-মানস
রইলো নিশ্চিকল্প, নিশ্চিকোর।
অধ্যাত্মের অব্যয় আবাসে
কথা আমার আজো রইলো অনুচ্চারিত।
কথার ওপর কথা গাঁথা
তাই আজো শেষ হোলো না।

বিস্ময়

বিজেন্দ্র মৈত্র

সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে এল বন্যার স্রোতের মতো,
উঠে এলো নিঃশব্দে যাদুঘরের শাদা-সফালনের মতো,
ধূসর আকাশে ধীরে ধীরে ফুটে উঠ্‌চে তারা।
যেন আঁধার নদীতে যাত্রীবাহী নৌকার আলোর শিখা।
বসন্তীর হাত থেকে বাতাস আসে কেঁপে-কেঁপে
তীক্ষ্ণ রজনীগন্ধার মৃদুগন্ধ ওড়িয়ে আছে হাতের অন্ধকারে।

তবু তুমি আর আমি, আছি পাশাপাশি এই আকাশের তলে
চাঁদ এখনো ওঠেনি, পূব আকাশে তার হলুদ রঙের আভা।
আমরা বেঁচে আছি, রয়েছি পাশাপাশি
তোমার চোখে দেখি স্নেহের স্বপ্ন আঁকা।
আমরা আছি, এর চেয়ে আনন্দময় বিস্ময় আর কী হতে পারে?
এ রহস্যের কূলসীমা নেই, ভাষাহীন অনির্বচনীয়।

কবিতা

স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

দুনিয়ায় কত রকমেরই পাগল থাকে।
এলুম নতুন ভাড়াটে বাড়ীতে :
প্রতিবেশী একজন অবসর-প্রাপ্ত হাকিম।
তাঁর বাড়ীর ছাদে আমার ছাদেরই পাশে,
মাঝে সরু একটা গলি।

বুড়োর পাকা দাড়ি,
হাসি হাসি মুখ, দুধ সবল শরীর।
বিকেলবেলা দেখি ছাদে দাঁড়িয়ে ঘুড়ি উড়োচ্ছে!
আমার চক্ষু ত ছানাবড়া,—বিস্ময়ে।

অনুনুম চতুর্লোকটি বিপত্নীক বয়স্থ।
মোম ঘুড়িতে কত কি ছাইভস্ম লিখে আকাশে উড়োন।
নাটাই-এর সুতো যখন ফুরোয়
সুতোর প্রান্তভাগটি হাতে নিয়ে ঘুড়িটা অনেকক্ষণ খেলান।

নক্ষত্র কখনও স্থির হয়ে থাকে,
কখনো বা একটা দীর্ঘ বৃত্তপথে ঘোরে।
তখন সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে
সেই রক্তিম্ পেক্সে ঘরনা খুড়ি,
ওরফে গগনবিহারী নিশিখণ্ড,
ধীরে ধীরে যখন মুক্তে মিশে যায়,
তখন তিনি ছুটোটা যেন ছেড়ে।
ঢাউসটা কোথায় উধাও হয়,
বোধ করি কোনো অচিন নক্ষত্রলোকে।

প্রত্যহই তাঁর এই খেলা।
লোকটির আর কোনো উপদ্রবের বালাই নাই।
অনেক রকম পাগ্‌লামি দেখেছি, গল্পেও শুনেছি।
কিন্তু এই অপ্রতিপূর্ণ বাতুলতার মর্মলীলা
দেখ্‌লাম অবাক্ হয়ে অচক্ষে।

পাড়ার লোকে বলে, ঘুড়িতে তিনি লেখেন কবিতা,
বিদেহিনী প্রেয়সীর উদ্দেশে।
ভোঁ-মারা ঘুড়ির লক্ষ যখন লুটিয়ে ভেসে যায়
অজানা বাড়ীর গায়ের উপর দিয়ে,
তখন পাড়ার ছেলেরা সেই উদ্ভ্রান্ত খণ্ডকাব্যের টুকরাটিকে
টেনে নামিয়েছে তার নিরুদ্দেশ যাত্রাপথ থেকে।
বেনামিতে মাসিকপত্রে ছাপিয়েছে,
অমিত, দিবিা দাস সেন্‌সিদের পাগা দিয়ে
তাঁর কাছে বিনা মাশুলে তাকে পাঠিয়েছে,
মায়, প্রত্যুত্তর সহ।

বৃত্তান্ত শুনে আমি হেসে ওদের বল্লুম,
অজানা কবিদের সঙ্গে বেচারির পার্থক্য কেবল
প্রণয়-নিবেদনের উচ্ছ্বসিত পদ্ধতিতে।
যাদের তাবো নিরুদ্ধাদ,
তারা নিজের নাম সই ক'রে
মাসিক পাক্ষিকে পাঠায় ছন্দোবদ্ধ উন্মাদনা,
কিম্বা গাঁয়ের পয়সা খরচ ক'রে ছাপায়
সিদ্ধি-খোকন বিক্রিওয়ালার মতোয় খোরাক।

গানে

স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

তোমার মুখে সেদিন একটা পুরানো গান শুনলাম।
অনেকের মুখেই শুনেছি সে গান।
তালমন্দ গলায় তার নানান মূর্তি দেখেছি।
সেদিন তার অভিনব রূপ ফুটল তোমার কণ্ঠস্বরে।

মেয়েদের বিয়ে হ'লে নৈসর্গিক পদবী বদলে যায়,
তারা পায় স্বামীর গোত্র নাম।
গানগুলিও বুঝি স্ত্রীজাতীয়
তাদের স্বচরিতার পরিচয় চাপা পড়ে
গায়কের স্বয়ম্বরায়।

হুঁকোর নলচে মালা কলকে বদলে গেল
সুরের মুগ্ধজালে।
মনে হ'ল কথাগুলো বোবা,
তাদের বাণী ফুটল তোমার অনুপ্রাণনায়।
এক বোঁটায় এত ফুলও ফোটে
ইন্দ্রজালিকার ভেল্কিতে।

হায় গায়িকা !
কথাগুলো যে ঝরা ফোঙে,
তোমার চোখে তারা হল মর্মকুশলী।
তারিক্, কমুলুম বটে,
কিন্তু কেমন করে অপরকে বোঝাই
কী আছে তোমার গানে।
কি ক'রে প্রত্যক্ষ করাব সেই ইন্দ্রজাল
যা শুধু একান্ত তোমার।

পশ্চিমের পাহাড়ে নদী,
ঝির্‌ঝির্ কম্‌ছে তার ক্ষীণ জলধারা,
ধূ ধূ করছে বালি আর বড় বড় পাথরের টুক্‌রো।
একবার দেখো তাকে নবমর্ষার উন্মাদনায়!
তোমার গানে সেই ফেনোচ্ছল দুরন্তধারা,
তরঙ্গে তরঙ্গে কবরিত কথার বালুকা বিথার,
পাথরে পাথরে উদ্বেলিত সংঘাতমর্মর।
এই তো গান!
প্রাণবন্যা ছুটে যায় উপলে-উপলে নূপুর বাজিয়ে।

নতুন কবিতা

পত্রপুট—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, একটাকা।

রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক কাব্য ক্রমশই যেন তত্ত্বে ও জ্ঞানে গভীর হ'য়ে আসছে। 'পুনশ্চ'র গদ্য কবিতাগুলোয় ছিলো লিরিকের অজস্র লীলা; 'পরিশেষে'র নাটকীয় কবিতাগুলোয় ছিলো মানুষের মনের উপর বিদ্যুৎ-তীব্র কটাক্ষপাত। এবং উভয় গ্রন্থেরই রচনাভঙ্গির ঝোঁকটা ছিলো সরলতার দিকে। 'পরিশেষে'র গদ্য একেবারে গদ্যের কাছে ঘেঁষা; 'পুনশ্চ'র ভূমিকায় গদ্য ছন্দ সম্বন্ধে যে দু'একটি নিয়ম তিনি উল্লেখ করেছিলেন, পদ্যের উপরে তা প্রয়োগ করলে কেমন হয় সেই পরীক্ষাই তিনি করেছিলেন 'পরিশেষে'। তার ফলে বাঙলা পদ্যের নতুন একটি ছাঁচ আমরা পেয়েছি, তা আরো বিচিত্র ব্যবহারের প্রতীক্ষা করছে।

'শেষ সপ্তক'ই রচনাগুলো ভবমুখী, কবির গভীর ও জটিল চিন্তা-প্রসূত। 'বীথিকা'তেও লক্ষ্য করেছি, যে-কবিতাগুলো নেহাৎই হালকা নয়, তাদের ঝোঁকটা ঐ দিকে। জীবনের অনুভূতির কথা নয়, অসংখ্য বিচিত্র অনুভূতির অন্তরালে যদি কোনো অপরিবর্তনীয় ভূমিরীক্ষ্য সত্য থাকে, এ-সমস্ত রচনায় তারই যেন সন্ধান। 'পত্রপুটে'র কবিতাগুলো বিশেষ ক'রেই এই ধরণের। কবিতার যে-দিকটা রহস্যের, যে-দিকটা চকিত অভাবনীয়ের আলোয় দীপ্ত, এই ধরণের রচনায় সেটা অপ্রাসঙ্গিক। গীতিকবিতায় ইঙ্গিতের ঐশ্বর্য এখানে আশা করা যায় না; এখানে বিশাল চিন্তার প্রসারিত ভালপালার মর্মর। পর-পর পনেরোটি গদ্য কবিতায় এই মর্মর আমাদের কানে ও মনে এসে লাগছে। সব কবিতাই এক হিসেবে স্বগতোক্তি, এ-কবিতাগুলো বিশেষ ক'রে আত্ম-ভাবণ। যত বড় বড় সমস্যার যেন পশ্চিমের সূর্যের চারদিকে ঘন হ'য়ে এসেছে,

এখানে তারই অপূর্ব বিচ্ছুরিত বর্ণচ্ছটা। জীবনের মূল সূত্রগুলি নিয়ে এই যে জল্পনা এ থেকে অনেক ভালো প্রবন্ধের সৃষ্টি হ'তে পারতো, রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাকে কাব্যের সংহত রূপ।

বাঙলা গদ্য ছন্দ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র প'ড়ে রয়েছে। এ-বিষয়ে নানারকম মত শুনেছি, অনেক অদ্ভুত মতও শুনেছি। কিন্তু গদ্য ছন্দ নিয়ে এখন পর্যন্ত কেউ কোনো প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন ব'লে আমি জানি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'ছন্দ' বইয়ে ও-বিষয়ে যেটুকু বলেছেন তাতে তার ভাবের ও রসের দিকটাই বুঝিয়েছেন, প্রয়োগ-রীতির প্রশ্নটা গেছেন এড়িয়ে। অথচ গদ্য ছন্দের আঙ্গিকের নির্ণয় এখনো অস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের নব-নব রচনার উদাহরণ থেকে অর্বাচীনের যে-শিক্ষা লাভ হয়, তা ছাড়াও আলোচনা, ইঙ্গিত ও নির্দেশের প্রয়োজন আছে। 'পত্রপুট' প'ড়েই এ-কথা বিশেষ ক'রে মনে হ'লো। কেন বলি। 'পুনশ্চ' ভূমিকাতেই শুধু রবীন্দ্রনাথ গদ্য ছন্দের দু' একটা স্বাভাবিক নিয়মের উল্লেখ করেছেন। সে-নিয়ম পণ্ডিতের অনুশাসন নয়, গদ্যের প্রকৃতির মধ্যে অনিবার্যরূপেই তা আছে। যেমন, বিশেষ ক'রে পদ্যেই ব্যবহার্য শব্দ গদ্য ছন্দে বর্জনীয়। এ-নিয়ম লঙ্ঘন করা অসম্ভব এ কথা নির্দ্বিধায়ই বলা যায়। (আমা তোমা হেন সব প্রভৃতি কথা পদ্যের এলাকার বাইরে এলেই অন্যায়।) রবীন্দ্রনাথে এর ব্যতিক্রম কখনোই দেখিনি, তবু

গিরিশৃঙ্গমালায় যহু মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতলতরঙ্গে কলমন্ত্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নবিতরা তুমি ভীষণা।
একদিকে আশন্তব্যাকুলতাবনয় তোমার পদপ্রান্তে,
সেখানে প্রদয় প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় নিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।

অস্তগামী সূর্য তার শেষ রশ্মিপাতে লেখে যায় অনন্তের এই বাণী—
"আমি আনন্দিত।"
অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আকাঙ্ক্ষাতুর মরুদেশে
দীর্ঘশ্বাস পড়ে অন্ধকারের মধ্যে মরীচিকার প্রেতমূর্তি।

উদ্ধৃত অংশ প'ড়ে (এবং এ-রকম 'পত্রপুটে'র পাতায় আরো আছে) মনে একটা সংশয়ের ধাক্কা লাগেই। সমাসে সন্ধিতে অনুপ্রাসে, অযৌক্তিক সংস্কৃত শব্দে এ রচনাংশটি এমনই জমকালো যে এর সঙ্গে পদ্য ছন্দের তালের মিলনই যেন মানাতো, এ যেন কোনো গম্ভীর কল্লোলিত ছন্দ থেকে ছিঁড়ে এসে হঠাৎ ঝুল ক'রে ঝুলিয়ে গেছে গদ্য হ'য়ে। আমরা তোমরা হেন-তেন যে-কারণে আপত্তি, ঠিক সেই কারণেই কি শিরিষপুষ্প-মালা নীলাম্বুরাশি অভ্রভেদক্ষম কলমন্ত্রমুখরাও অবৈধ নয়? গদ্য প্রকৃতই মুখের ভাষা নয় কি, বিশেষ ক'রে গদ্যে যখন কবিতা লেখা হয়? যৌক্তিক গদ্যে বরঞ্চ গ্রন্থগত সংস্কৃত শব্দের স্থান আছে, কেননা সেখানে যথাযথ বোধগম্যতাই উদ্দেশ্য। কিন্তু কবিতা চলে ভাবের ইঙ্গিত নিয়ে, এবং গদ্যে সেটা ফোটে মৌখিক ভাষার প্রাকৃত লীলাতেই। মুখের ভাষার সহজ প্রাণ-স্পন্দনের জোরেই গদ্য কবিতা হ'য়ে উঠতে পারে। এ-শিক্ষা আমার রবীন্দ্রনাথের কাছেই হয়েছে, সুতরাং আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থে 'সংস্কৃত' শব্দের ও বাক্য-ভঙ্গির আতিশয্য দেখে নিজের সংশয় প্রকাশ না-ক'রে পারলাম না। যে-ভাষা চিত্রাতে সোনার তরীতে সহজ ছিলো, সেটাই কি হ'তে পারে গদ্য ছন্দের উপযুক্ত বাহন, না কি গদ্য ছন্দের জন্য নতুনরকমের ভাষা সৃষ্টি ক'রে ও বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কবির দরবারে এই প্রশ্নটি আমি উত্থাপন করছি। এর জবাব পাওয়া প্রয়োজন—কেননা রবীন্দ্রনাথ এখন যা করছেন কি করবেন তার উপর গদ্য ছন্দের ভবিষ্যৎ পরিণতি অনেকখানিই নির্ভর করছে।

বুদ্ধদেব বসু

জি, কে, চেস্‌টারটন

সর্বতোমুখিতা এই বিংশ শতাব্দীর লেখকদের একটা বিশেষত্ব ব'লে মনে হয়। তার কারণ বোধ হয় এই যে ইয়োরোপেও সাহিত্য পুরোপুরি একটা সেনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এই বিংশ শতাব্দীতেই। তা ছাড়া, ইংলণ্ডের সাহিত্যের সাত শতাব্দীর ঐতিহ্যের ফলে এখন সাহিত্যের সবগুলি রসই পূর্ণ পরিণত: একদিকে যাঁর জন্মগত ক্ষমতা অন্যদিক-গুলো তাঁর একেবারে অনধিগম্য কখনোই থাকে না। এর ফলে কিছু হয়-তো রসহীনতা কি অনধিকারপ্রবেশ হয়েছে, কিন্তু এ-কথাও মানতে হবে যে এরই ফলে আমরা সম্প্রতি কয়েকটি অতি আশ্চর্য লেখককে পেয়েছি। জি, কে চেস্‌টারটন ছিলেন তার মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য। আধুনিক সর্বতোমুখিতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তিনি। তাঁর অজস্র গদ্য রচনা গল্পে প্রবন্ধে সমালোচনায়, অফুরন্ত হাসিতে ও তামাসায়, তর্কে ও তত্ত্বে, রহস্যে ও রোমহর্ষণে, রাগে ও মিষ্টতায় বিমণ্ডিত; এ-যুগের ইংরিজি গদ্যের তিনি নিঃসংশয়েই অন্যতম নায়ক। হয়তো তাঁর এই অপরূপ ও অতি-প্রচুর গদ্যই তাঁর কবিতাকে একটু আড়াল করেছে। তবু কবি হিসেবেও তিনি অসাধারণ। কাব্যের রাজ-সভা পর্যন্ত যাঁদের পথ পরিষ্কার হয় না, তাঁদের মধ্যেও যে সত্যিকারের প্রতিভার বিদ্যুৎ-ঝলকানি দেখা যায়, এ-দৃষ্টান্তের অভাব ইংরিজি ভাষার অন্তত নেই। মাত্র বছর দুই পূর্বে প্রকাশিত চেস্‌টারটনের সমগ্র সংগৃহীত কাব্য পড়লে বোঝা যায়, তিনি শুধু কিপ্‌লিঙ-ঘেঁষা ছন্দে ইয়েম্ব মাস্তাদের তৈরি টলোমলো রাস্তায় তারিফ ক'রেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর কাব্য-প্রতিভাও একান্ত নিজস্ব ও বিশেষরকমের, বহুল ও বিচিত্র তার প্রকাশ। তাঁর চিত্রকল্পময় মূর্তিত্ব ব্যক্তিত্ব ফুটেছে তাঁর কাব্যের প্রতি পংক্তিতে; তাঁর খেয়ালী কল্পনার কত অদ্ভুত ছলক ক্ষণে-ক্ষণে চমক লাগায়। তাঁর যে জীবনদর্শন আঁড়ার

রচনারাশিতে পাওয়া যায়, তাঁর কবিতায় সেটাই প্রতিফলিত। আধুনিক 'বৈজ্ঞানিক' মনোভাবের তিনি মহৎ শত্রু। যন্ত্র-নির্ভর, যুক্তি-নির্ভর জীবনের যন্ত্রণা বিবর্ণতাকে আক্রমণ ক'রে কখনো তিনি ক্লান্ত হতেন না। তাঁর রোমান ক্যাথলিক মন যেন গথিক গির্জার অভ্যন্তরেরই মতো। কল্পনায় অলৌকিক রঙে আর স্বপ্নের আঁকাবাঁকা ছায়ায় সেখানে চিরন্তন গোধূলিবেলার রচনা। আধুনিক সভ্যতার সবই অতিস্পষ্ট, অতিশয় স্পষ্ট। বাইরের ঐশ্বর্য্যের আড়ালে তার শূন্যতা ও ব্যর্থতা ছিলো চেস্টারটনের প্রধান আক্রমণের বিষয়। তিনি ছিলেন রহস্যের পক্ষে, অনিশ্চিত অস্পষ্টের পক্ষে, কটিনের বদলে খেয়ালের পক্ষে, যুথবদ্ধ আমোদের বদলে ব্যক্তিগত স্বতঃস্ফূর্ত উপভোগের পক্ষে।

বিদ্রূপের সহজ ক্ষমতা ছিলো তাঁর। সে-বিদ্রূপে জ্বাল ছিলো না, ধার ছিলো। তাঁর অনেক কবিতায় আছে সরস ঠাট্টার ছলে মর্মান্তিক সত্যের উচ্চারণ। কবি হিসেবে তাঁকে কিছু সেকেলেই বলতে হয় বুঝি। অন্তত, আধুনিক বলতে কবিতায় যে-নতুন ও বিশেষ একটা গুঢ়ি আজকাল সূচিত হয়, সেটা ছিলো না তাঁর কাব্যে। তাঁর ঠিকুজি টানতে হয় উনিশ শতকের শেষ থেকেই, কিপলিঙ থেকে; দোলায়িত ছন্দে আর মর্মরিত মিলে আমাদের দেশের মুটির মতো ঝমঝম ক'রে বাজে তাঁর কবিতা। আধুনিক কালের কোনো-কোনো মহৎ কবি থেকে তিনি এই হিসেবেও আলাদা যে তাঁর কবিতা প'ড়েই বোঝা যায়। যাঁরা আধুনিকতার উচ্চতম শিখরে, তাঁরা হয়-তো এটা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না: জটিলতা ও দুর্বোধ্যতাই যে সাহিত্যিক নীলরক্তের চিহ্ন। কিন্তু অনেক সময় দুর্বোধ্যতার পিছনে দম্ভ কি অক্ষমতা ছাড়া কিছুই থাকে না। চেস্টারটনের কবিতা সাধারণের জন্য, যে-অর্থে ফুল পাখি শিশু—সাধারণের উপভোগের জিনিস। ও-সব বস্তুর রস-গ্রহণ বিশেষ কোনো শিক্ষাসাপেক্ষ নয়, অথচ বিশেষ শিক্ষা ও সাধনা যাঁর আছে তাঁর পক্ষেও ও-সব ভালো লাগা একেবারে অসম্ভব নয় ব'লেই আমা

করি। জীবনের যত সহজ, সাধারণ, অ-শিক্ষিত, প্রবৃত্তিগত উপভোগ, চেস্টারটনের কবিতা তা-ই নিয়ে। প্রায়ই তাঁর সুর ঈষৎ চড়ায়, অবারিত উচ্চহাসির, তিনি যেন চোখ মেলে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েই মাতাল হ'য়ে আছেন। কখনো অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে গভীর কথা উচ্চারণও তনেছি তাঁর মুখে, আবার কখনো যেন একেবারেই খুশি সামলাতে না পেরে তাঁর ভাষা সীমা ছাড়িয়ে আবোল-তাবোল হ'য়ে উঠেছে।

They haven't got no noses
The fallen sons of Eve;
Even the smell of roses
Is not what they supposes;
And goodness only knowses
The Noselessness of Man.

এই উচ্ছ্বসিত উচ্চহাসির আনন্দ আধুনিক জীবনে ও সাহিত্যে ক্রমশই বিরল হ'য়ে আসছে। তাঁর অজস্র লেখার ভিতর দিয়ে যে-একটি হাসিখুসি খামখেয়ালি মানুষের অথচ নিভীক সত্যান্বেষী মানুষের সঙ্গে এতদিন ধ'রে পরিচয়, আজ তাঁর অভাবে নিজেকে সত্যই দরিদ্র মনে হচ্ছে।

দুই ও তিন

'ছন্দ' ব'লে সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে-বইটি বেরিয়েছে তার প্রবন্ধগুলিতে বাঙলা ছন্দের মূলসূত্র যত সহজে যেমন স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত হয়েছে তেমন এ-পর্যন্ত আর কোথাও হয়েছে ব'লে জানিনে। এ-ধরনের আলোচনা কবির পক্ষেই সম্ভব, পেশাদার পণ্ডিতের পক্ষে নয়। এতে ছন্দের বাইরের ছন্নটার চুলচেরা বিশ্লেষণের চাইতে অন্তরের রহস্যই উদ্ঘাটন হয়েছে বরঞ্চ। কোনো ছন্দই পরিভাষার সাহায্য না নিয়ে বাঙলা ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি দু' মাত্রা ও তিন মাত্রার ছন্দে

তাগ করেছেন। এ-বিভাগটা বোঝা খুবই সহজ। কোনো এক ছাত্রসিক কোনোকালে এর জন্যে ধ্বনিমাত্রিক ও শব্দমাত্রিক এ দুটি শব্দ তৈরি করেছিলেন। প্রভেদটা আসলে এইখানে: দুইমাত্রার ছন্দে যুক্তাক্ষরকে একমাত্রা ব'লে ধরা হয়, তিনমাত্রার ছন্দে ধরা হয় দুই মাত্রা বলে। কথাটা সম্পূর্ণ হয় এই বললে যে দুইমাত্রার ছন্দে যুক্তাক্ষরকে এক ব'লেও ধরা যেতে পারে, অবস্থাভেদে দুই বললেও দোষের হয় না; কিন্তু তিনমাত্রার ছন্দে যুক্তাক্ষরকে দুই না-ধরলেই ছন্দ কাটবে। এ থেকেই সূচিত হচ্ছে যে দুই মাত্রার ছন্দে স্বাধীনতা বেশি, স্বভাবের হাতে তার সঙ্কুচন প্রসারণ অতি অনায়াসেই চলে. তিন মাত্রার ছন্দ সঙ্কীর্ণ, একেবারে ইঞ্চি-মাপা, তাতে বেটুকু ধরে তার বেশি আর ধরে না।

দুই মাত্রার ছন্দের মূল ছাঁচ হ'লো পয়ার। পয়ারটা খুব ব্যাপক অর্থে ধরছি: কাশীরাম দাসও পয়ার, মধুসূদনও পয়ার। পয়ারের আশ্চর্য্য নমনীয়তা—প্রায় অপরিসীম সঙ্কুচন ও প্রসারণের ক্ষমতা—এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা ও আলোচনা থেকে আমাদের শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু 'ছন্দ' বইটিতে তিনি যেন মোটের উপর তিন মাত্রার ছন্দের প্রতিই পক্ষপাত করেছেন। এতে আমি একটু অবাক হয়েছি। পয়ারের প্রতি তিনি এই ব'লে কটাক্ষপাত করেছেন যে ওটা 'সাধু' ভাষার ছন্দ: আর তিনমাত্রার ছন্দ হচ্ছে বাঙলার নিজস্ব, বাউল গানে যেমা যায় তার আবিরূপ। তারপর হসন্ত বেশি থাকে বলে তিনমাত্রার ছন্দে শব্দের এমন একটি ঢেউ-তোলা ছন্দুলানি শোনা যায়, পয়ারে যা কিছুতেই সম্ভব নয়। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে তিন-মাত্রার প্রতি আছে তাঁর বরাবরকার ব্যক্তিগত দুর্বলতা।

শেষের কথাটা দিয়েই আরম্ভ করি। রবীন্দ্রনাথের তিনমাত্রার রচনা অজস্র, কিন্তু হিসেব করলে দেখা যাবে তার বেশির ভাগই গান। দুই মাত্রার রচনাও তাঁর অজস্র, সেগুলি সবই কবিতা, গান নয়। হিসেব করলে দেখা যাবে যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির বেশির ভাগই

পয়ার জাতীয় ছন্দে লেখা ('কণিকা' ও আখ্যানের কবিতা বাদ দিয়ে।) বাউল গান গানই, কবিতা নয়; এমন কি, রবীন্দ্রনাথের গানও সুরে বেঁধে গাওয়ার জন্যেই। গানের স্রোত যখন তিন মাত্রার ছন্দ, তিনমাত্রার নির্ঝর ক'রে চলেছে বাঙলার নিজস্ব গানের ছন্দ। পয়ারও বাঙলারই প্রাকৃত ছন্দ, পয়ার জাতীয় ছন্দই প্রথম থেকে বাঙলা কবিতার প্রধান অবলম্বন, এবং রবীন্দ্রনাথের হাতে প'ড়ে পয়ারের আশ্চর্য্য প্রসার ও পরিণতি ঘটেছে। পয়ারকে যে ইচ্ছেমত বাড়ানো কমানো যায়, এবং তার ফলে যে গভীর ও বিচিত্র ধ্বনির সৃষ্টি হয়, এটা রবীন্দ্রনাথেরই আবিষ্কার। হেম বাঁড়ুয্যে নবীন সেনের নিষ্প্রাণ চতুর্দ্দশীর অসহ্য পৌনঃপুনিকতার সঙ্গে 'নিষ্ফল কামনা' কি 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কি 'বলাকা'র মনে-মনে একবার তুলনা করলেই চলবে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথই যখন বলেন যে পয়ার জাতীয় ছন্দ 'সাধু' শব্দের চাপে স্বভাবতই ক্লিষ্ট, তখন খুব বেশি ক'রেই অবাক লাগে। ক্লিষ্ট যখন হয়, সেটা কবির অক্ষমতা, ছন্দের স্বাভাবিক দুর্বলতা নয়। অক্ষমের হাতে তিনমাত্রার ছন্দ শুধু ক্লিষ্ট নয়, অসহ্যরকম জোলো হ'য়ে ওঠে। 'করিতেছি' আর 'করছি' এ দুটো শব্দের মধ্যে দ্বিতীয়টাতে সুর বেশি, জোরও বেশি কবির এ-কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু তাই ব'লে পয়ারকেই কি দোষ দেয়া যায়? 'সাধু' ক্রিয়াপদ কি পয়ারের ধর্ম? অবশ্য প্রাক্-রবীন্দ্র কবিদের রচনায় পয়ারে ক্রিয়াপদমাত্রেই 'সাধু' কিন্তু রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন যে পয়ারে প্রাকৃত ক্রিয়াপদ অনায়াসেই চলে, এবং 'করিতেছি'র মত বিশ্রী শব্দ এড়িয়ে যেতে খুব বেশি কলাকৌশলীও হ'তে হয় না। ন্যূনতম ক্রিয়াপদ ব্যবহার ক'রে 'নিষ্ফল কামনা'র মত আশ্চর্য্য কবিতা লেখাও সম্ভব। এতদিন রবীন্দ্রনাথের পয়ারে 'সাধু' ও চলতি দু' রকমের ক্রিয়াপদই থাকতো, কোনোখানেই কখনো খটকা লাগেনি। তারপর 'পরিশেষে' তিনি দেখিয়েছেন পয়ার এমন ক'রে 'সাধু' ভাষাকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে চলতে পারে। ভবিষ্যতের পয়ার-লেখকেরা হয়তো মোড় নেবে।

ধ্বনির দিক থেকে পয়ার খাটো এ-কথা কিছুতেই স্বীকার করবো না। বরং এ-কথাই জোর ক'রে বলবো যে গভীর ধ্বনির ঝঙ্কার, সূক্ষ্ম-বিসর্পিত সুরের বৈচিত্র্য পয়ারেই সম্ভব, তিনমাত্রার কিছুতেই নয়। তিনমাত্রায় ঢেউ ওঠে বটে, কিন্তু সে-ঢেউ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, সে-ঢেউ তালেই মিলিয়ে যায়, মরমে পৌঁছতে পারে না। তিন মাত্রা বাজে, কিন্তু সে-বাজনা টুন্‌কো ও হাল্‌কা ধরণের। কেননা তাতে ঠিক যেটুকু ধরে তার বেশি কিছুতেই ধরে না। তাতে বৈচিত্র্য নেই, নতুন সম্ভাবনা নেই, কবির নিজস্ব সৃষ্টির জায়গা নেই। তার তালটা পুল। যতক্ষণ প'ড়ে যাওয়া যায় কান খুশি হয়, কিন্তু পড়া হ'য়ে গেলে মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি নাও থাকতে পারে। পয়ারের প্রতিধ্বনি গভীর। পয়ার হারা দেয়। পয়ার যদি সত্যি-সত্যি ভালো লেখা হয় তার যে ধ্বনির বেগ ও লীলা, পদে-পদে যে অদ্ভুত বৈচিত্র্য বাঙলা ভাষায় আর-কিছুতেই তা দেখা যাবে না। তিনমাত্রার দাবি অনস্বীকার্য, গানে কি সঙ্গীতধর্মী গীতি-কবিতায় তা খুব বেশিই কাজে লাগে, কিন্তু এও ঠিক যে তার কাঠামোটায় একেবারেই কোনো-রকম নড়চড় হয় না ব'লে তাকে নিয়ে খুব বেশি ঘুরও যাওয়া যায় না। তার একটাই সুর। কিন্তু পয়ার যেন কোনো বিশাল আশ্চর্য যন্ত্র, গুণীর হাতে তা থেকে যে-কোনো সুর বেরোয়। অত্যন্ত গম্ভীর থেকে অত্যন্ত চটুল, অত্যন্ত মন্থর থেকে অত্যন্ত দ্রুত—পয়ার সবই হ'তে পারে। তিনমাত্রার একঘেয়েমি ছাড়া হবার উপায় নেই। পয়ারের ছাঁচে অনেক-খানি ফাঁক থাকে, কবি সেটা ইচ্ছেমত ভরিয়ে কি না-ভরিয়ে নানারকম ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারেন; তিনমাত্রা সর্বদাই কানায়-কানায় ঠাসা, তার বেশিও নেই কমও নেই। পয়ারের বিরুদ্ধে 'সাধুতা'র অভিযোগ এখন কি আর আনা যায়, যখন দেখা যাচ্ছে চলতি ভাষাকে সহজেই সে আপন ক'রে নিচ্ছে?

CALCUTTA CENTRAL

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : প্রেমেন্দ্র মিত্র : কার্যাধ্যক্ষ সমর সেন : ১১।১এ বিডন্‌ষ্ট্রীট, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

কবিতা

দ্বিতীয় বর্ষ, পৌষ, ১৩৪৩ দ্বিতীয় সংখ্যা

মুক্তপথে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঁধাও দুয়ার আরো আগল দিয়া,
চক্ষু করো রাঙা,
ঐ আসে মোর ভাঙা-খোয়ানো হিয়া
রুদ্র-নিরম-ভাঙা।
আসন পাতার কাঙাল ও নয় তো
আচার-মানা ঘরে,—
আমি ওকে বসাব হৃদয় তো
মহলা কাঁথার পরে।
সাবধানে রয় বাজার দরের যে জিনে
সাধু গেরস্থের লোক,
ধুলায় ধরণ ধূসর বেশে ও যে
এড়ায় তাদের চোখ।
বেশের আদর করতে গিয়ে ওরা
ভূষণ আদর ভোলে ;—
আমার পাশে ও মোর মনোচোরা
একলা এসো চ'লে।

হঠাৎ কখন এসেছ ঘর ফেলে
তুমি পথিক-বধূ,
মাটির ভাঁড়ে কোথা থেকে পেলে
পল্লবনের মধু ?
ভালোবাসি তাদের সহজ খেলা
এসেছ তাই শুনে,
মাটির পাত্রে নাইক আমার হেলা
হাতের পরশগুণে !
পায়ে নূপুর নাই রহিল বাঁধা
নাচেতে কাজ নাই,
যে-চলনটি রক্তে তোমার সাধা
মন ভোলাবে তাই।
লজ্জা পেতে লাগে তোমার লাজ
ভূষণ নেইক ব'লে,
নষ্ট হবে নেই তো এমন সাজ
ধূলোর পরে চ'লে।
গাঁয়ের কুকুর ফেরে তোমার পাশে
রাখালরা হয় অচেনা,
বেদের মেয়ের মতন অবাধালে
চাষী ঘোড়ায় চড়ো।

তিথে পাখি হাটুর পরে তুলে
পায় হ'য়ে যাও নদী,
যাদুনগাড়ার রাস্তা যে যাই ভুলে
তোমায় দেখি যদি।
হাটের দিনে শাক তুলে নাও ক্ষেতে
চুপড়ি নিয়ে কাঁখে,
মটর তুলাই ধাওতাও আঁচল পেতে
পথের পাশটাকে।
মানো নাকো বাদল দিনের মানা,
কাদায় মাখা পায়ে
মাথায় তুলে কচুর পাতাখানা
যাও চ'লে দূর গাঁয়ে।
পাই তোমারে যেমন খুসি তাই
যেথায় খুসি সেথা।
আয়োজনের বালাই কিছু নাই
জানবে বলো কে তা।
সতর্কতার বাঁধ ঘুচায়ে দিয়ে
পাড়ার অনাদরে
এসো ও মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়ে
মুক্তপথের পরে।

৬।১১।৩৬

গীতি-গুচ্ছ

হেমচন্দ্র বাগচী

অপরূপ বিরহ

মনে আমার একটি অপরূপ বিরহ জাগে
গানের সুরের মত সে বিরহ।
কত বেদনার ধারা এসে যেন মিলেছে মনে—
বনপ্রান্তের বিষণ্ণ ছায়ার মত সে বিরহ।

বিস্মৃত দিনের কাহিনী

যারে যারে একটি সুর এসে যেন যাচে
হৃদয়ের মাঝে নিঃশব্দচরণে নেমে আসে
ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিস্মৃতদিনের কাহিনী।
জীবনের পর উত্তাপের উপর নামে অশ্রান্ত বর্ষণ
চিত্ততল স্নিগ্ধ হ'য়ে আসে।

চেয়ে চেয়ে দেখি

কতদিন চেয়ে চেয়ে দেখি
চোখে রঙের নেশা লাগে—
বর্ষার ভরা নদী, কাশফুল,
মাঝে মাঝে এক একখানি নৌকো ভেসে চলেছে,
গাঁয়ের লোকগুলি চলেছে নিঃসঙ্গে
দেখি আর মনে হয়—
এ যেন পৃথিবীর অর্ধাবগুণ্ঠিত রহস্যময় মুখ
নেপথ্যে চলেছে অদ্ভুত আয়োজন
এই চিত্রটিকে তুলে ধরবার জন্য।

বর্ষার দিনে

বর্ষার দিনে গঙ্গার তটরেখার রেখায়
চলেছে আমার মন।
বাবলাগাছের হরিদ্রাভ ফুল—
অসংখ্য পাখীর একতান কলরব
শালিখ পাখীর মেলা—
এই শ্যামল শোভার মধ্যেও
হৃদয়ের কান্না থামে না কিছুতেই।

বড় সুন্দর এই পৃথিবী

বড় সুন্দর এই পৃথিবী।
যাব যার এই
অপরূপ সবুজ শোভার মধ্যে
বেঁচে থাকি কিছুকাল।
শুধু দেখি আর স্বপ্নের মায়াভুবন
রচনা করি
অগণন মুহূর্তের ফাঁকে ফাঁকে।

ছুটি

মনে হয় যেন ছুটি পেয়েছি
সমস্ত চিরাচরিত মানব-পন্থা থেকে
মুক্তি পেয়েছি আমার মনে।
ভিতরের মানুষটাকে কে জানে?
সে শুধু বীণা বাজায় আর গান গায়
আর উদাসীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে
যেখানে শ্যামল মনের অন্তরালে
তীক্ষ্ণ কাঠবিড়ালী ত্বরিত-গতিতে
যাওয়া-আসা করে নিঃশব্দ, নিঃসঙ্কোচ!

খাতা

খাতা আমার শেষ হ'য়েছে।
এখনকার টুক্‌রো জীবন সুদূর সমগ্রতাকে পায় না।
তাই ছোট ছোট ভাবনাগুলি মনের তারে তারে যে আঘাত
যেন
তারই কম্পন রেখে যেতে ইচ্ছা করে
কলমের আখরে আখরে।

মানসশিল্পী

কাগজে প্রকাশের তাগিদ নেই
আর রচনায়।
এই সময়েই মানসশিল্পীর আনন্দ।
ব'সে ব'সে ছবির পর ছবি,
রেখার পর রেখা
রঙের পর রঙ।
অরসিকের কল্পনাহীন থেকে নিশ্চিন্ত পলায়ন।

প্রচ্ছায়া

এক এক সময় অনুভব করি
পৃথিবীর বক্ষবিদারণ যে স্তব্ধ-উৎসারিত রসধারা,
আমি যেন তা'রই প্রান্তরেখায় বিস্মিতদৃষ্টি বালকের মত ব'সে আছি।
চিরকাল যেন স্তম্ভিত হ'য়ে আছে
আমার সেই মুহূর্তদর্শনের কাছে।
মনে মনে বলি,
হে প্রচ্ছায়া, তোমার গুণ্ঠন আর অপসারিত ক'রো না
অত প্রখরতা সইব কি ক'রে?

মূঢ়া

মূঢ়ে, এত ঐশ্বর্য তোমার?
চেয়ে চেয়ে চোখের পলক যেন আর পড়ে না।
এত স্তব্ধ তুমি, মনে হয় ঘুঘুর ডাকের মধ্যেও
এত অতল স্তব্ধতা নেই।
স্থির হ'য়ে আছি
সমস্ত দেহ মন
একটি অপূর্ব আনন্দ-চেতনায় কেন্দ্রে আত্মহারা।
তিল তিল সামান্যকে নিয়ে তুমি অসামান্যা।
আমাকে শতধা বিচ্ছিন্ন ক'রেও আশা মেটে না কিছুতেই।

ভাঙা কোঠাবাড়ি

অনেক দিনের ভাঙা কোঠাবাড়ি,
কাঁটাল আর নারকেলের বাগান,
তা'রই ফাঁকে ফাঁকে দেখি
একটি মেয়েকে
শ্যামল বনশোভার মত,
মনের পীড়া যে দূর করে
এমন মেয়ে।

সে আমার জলাশয়

তোমের আবৃত্তিগুঞ্জন শুনতে পাই—
কাপড় কাচার শব্দ,
হাঁসের পাখাঝাড়ার শব্দ,
জলযন্ত্রের নিত্য আবর্ত্তমান ঝক্-ঝক্ শব্দ,
মনে হয়, নদী চলেছে এঁকে বেঁকে
আমার মনের নদী
কাশফুলে ভ'রে গেছে তা'র দুই তীর।
ফুরাণেরা কাজ করছে ক্ষেতে
বহুরা সারি বেঁধে চলেছে পথে,
সে আমার জলাশয়।

কল্যাণী বধূ

যেখানে কল্যাণীবধূ আপন নীড় রচনা করে,
যেখানে তা'র মঙ্গল হস্তের কাজল বাজে,
যেখানে অতিথি ভিক্ষুক সম্মানিত,
ইচ্ছা করে, আমি সেই নিভৃত নীড়ের দ্বারদেশে একবার দাঁড়াই
লোক-লোকান্তর উত্তীর্ণ হ'য়ে যে জীবনধারা,
সেই জীবনকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে সাধ যায়।

কবির ভাবনাধারা

কবির ভাবনাধারাকে অনুসরণ করবে কে?
আলসী মনস্তরীতে তা'র যাত্রা,
শরতের লঘুমেঘের মত তার ভাবনা।
কোথাও বাঁধা পড়ে না, দাগ থাকে না কিছুতেই—
ঘন জনতার মধ্যেও তার নির্জ্জন বাস।

মনের শিথিল ভাবনাগুলি

মনের শিথিল ভাবনাগুলি আশ্বিনের শিথিলবৃন্ত শেফালির মত
শ্যামল দূর্ব্বার উপরে ঝ'রে পড়্‌তে চায়।
শিশিরে ঝলমল শ্যামল দূর্ব্বা,
আর অঞ্জলিতে টলমল জলধর।
ইচ্ছা করে সারাদিন কান পেতে থাকি
এই বিচিত্র জগতের বিচিত্র ধ্বনিসম্ভারের দিকে
শব্দের পর শব্দ, কথার পর কথা
আর তরল গলিতস্বর্ণ প্রভাতরৌদ্রের দিকে চেয়ে থাকি
সারাদিন, সারাদিন।

একটি ছোট পতঙ্গ

কোথায় একটি ছোট পতঙ্গ বাসা বাঁধ্‌ছে
আমগাছের শুক্‌নো ডালের ভিতরে।
তা'র সেই শ্রান্তিহীন কর্ম্মের তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ এসে লাগ্‌ছে
আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে।

অপরূপ শরৎপ্রভাতে সেই শব্দ আমার কত ভালোই না লাগ্‌ছে!
ছোট্ট একটি পাখী বারে বারে ডাক্‌ছে—কুকুলি কুকুলি!
মনে হয়, এই উৎকণ্ঠিত আবেষ্টনীর মধ্যে লক্ষিত হ'য়ে আছে
চিরযুগের মধু—
তা' আমাদের কর্ণহারা দৃষ্টির নেপথ্যে।

মহাকাব্য

মানুষের জীবনধারার পরিপূর্ণতা কোথায়?
বিধাতার মহাকাব্য রচিত হচ্ছে
লোক থেকে লোকান্তরে—
আর বিদ্রোহী প্রিয়ার চটুল চাহনির তলে
কত দেশের অক্ষ্যয়, কত প্রশ্নের সমাধান—
কত প্রেরণায় আত্মবিসর্জন।
মানুষের চিরদিনের মহাকাব্য সেইখানেই
তা' সে গুহাগানেই হোক আর পন্নায়েই হোক।

সিন্ধুসারস

জীবনানন্দ দাশ

দু এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি
হে সিন্ধুসারস !
মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতিদূর তরঙ্গের আলোড়ায় নামি
নাচিতেছ টায়ার্‌-টেলা—রহস্যের ; আমি এই সমুদ্রের পায়ে চুপে থাকি
ছেয়ে দেখি বরফের মত শাদা ডানা দুটি আকাশের গায়
ধবল ঢেলার মত নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়।

মুছে যায় পাহাড়ের শিরে শিরে পৃথিবীর অন্ধকার গান
হে সিন্ধুসারস,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বাস ;—আবারে তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মত ঘ্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত মুখে ;—আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান।

জান কি অনেক যুগ চ'লে গেছে ? ম'রে গেছে অনেক নৃপতি ?
হে সিন্ধুসারস,
অনেক সোনার ধান ক'রে গেছে জান না কি ? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ভ্রান্ত ক'রে দিয়ে গেছে,—হারায়েছি আনন্দের গতি
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, বাধা, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,—এই বর্ত্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান ?

জানি না কি ওগো পাখি, সাদা পাখি ওগো নীল মানবের কেনার সন্তান !
হে সিন্ধুসারস,
তুমি সিন্ধু চাহনাক', তোমার অতীত নাই, স্মৃতি নাই, বুকে নাই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি : পৃথিবীর পাখিদের মত নাই শীতরাতে ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে রক্ত করেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নাই তব; নাই নিরক্ষুমি—নাই আনন্দের অশ্বরাগে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

স্বপ্ন তুমি দেখ নি ত',—পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
হে সিন্ধুসারস,
বিপরীত দীপে ঘুরে মানবীর আরসীতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ;—সন্ধ্যার নদীর চেউয়ে আসন্ন গল্পের মত রেখা
প্রাণে তার,—ম্লান চুল,—চোখ তার হিজল বনের মত কালো ;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো

নিভে গেছে ;—তুমি আর দেখ নাক'—যেখানে সোনার মধু ফুরায়েছে,
কবে না ফুরান

হে সিন্ধুসারস,

মাছি আর ; হলুদ পাতার গন্ধে ভ'রে ওঠে অধিচল শালিখের মন,
মেঘের দুপুর আসে—সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন
মেঘের দুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে ;
সেখানে আকাশে কেউ নাই আর, নাই আর পৃথিবীর ঘাসে।

তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেন নাক' ;—অথবা রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে

হে সিন্ধুসারস,

জান নাক' আজো কাকী বিধিশার মুখশ্রী মাছির মত ভরে ;
সৌন্দর্য্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে :
গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চোখ বাঘিনের,—ইন্দ্রধনু ধরিবার ফাঁদ আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন !

এই সব জান নাক' প্রবাসশঙ্কর ঘিরে তাদের উল্লাসে

হে সিন্ধুসারস,

রৌদ্রে ঝিল্‌মিল্ করে শাদা ডানা শাদা ফেনা-শিশুদের পাশে
হেলিওট্রোপের মত দুপুরের অসীম আকাশে !
ঝিক্‌মিক্ করে রৌদ্রে বরফের মত শাদা ডানা,
যদিও এ পৃথিবীর সব চিন্তা সব তার অজানা।

চকল নরের নীড়ে কবে তুমি—জন্ম তুমি নিয়েছিলে কবে
হে সিন্ধুদারস,
বিধর পৃথিবী ছেড়ে দলে দলে নেমেছিলে সবে
আরব সমুদ্রে, আর চীনের সাগরে,—দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে !
শীতার্ত এ পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিলে কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে !

ধানের রসের গন্ধ পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ
হে সিন্ধুদারস,
পৃথিবীর শস্যমালা নারী সেই,—আর তার প্রেমিকের ঘ্রাণ
নিঃসঙ্গ দুঃখের রূপ,—বিশুষ্ক দুঃখের মত প্রাণ,
তুমি তাহা কোনোদিন জানিবে না ;—সমুদ্রের নীল আনাচায়
আমারি শৈশব আজ আমাদেরই আনন্দ জানায়।

রাত্রিমাখা ঘাসে

জীবনানন্দ দাশ

একবার নক্ষত্রের দিকে চাই—একবার প্রান্তরের দিকে
আমি অনিমিখে।
ধানের ক্ষেতের গন্ধ মুছে গেছে কবে
জীবনের থেকে যেন ; প্রান্তরের মতন নীরবে
বিজ্ঞির খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার ;
নক্ষত্রেরা বাতি জেলে—জেলে—জেলে—'নিভে গেলে—নিভে গেলে ?'
ব'লে তাকে জাগায় আবার ;
জাগায় আবার।
বিকল খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে—বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার,
ঘুম পায় তার।

অনেক নক্ষত্রে ভ'রে গেছে এই সন্ধ্যার আকাশ—এই রাতের আকাশ ;
এইখানে ফাল্গুনের ছায়ামাখা ঘাসে শুয়ে আছি ;
এখন মরণ ভালো,—শরীরে লাগিয়া রবে এই সব ঘাস ;
অনন্ত নক্ষত্র রবে চিরকাল যেন কাছাকাছি।

কে যেন উঠিল বেঁচে,—হামিদের ঝকঝকে কানা ঘোড়া বুঝি !
সারাদিন গাড়ী টানা হ'ল শেষ,—ছুটি পেয়ে জ্যোৎস্নায় নিজ মনে খেয়ে
যায় ঘাস।
যেন কোনো বাধা নাই পৃথিবীতে,—আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি ?
'কেন মৃত্যু খোঁজ তুমি ?' চাপা ঠোঁটে বলে ঘুম কৌতুকী আকাশ।

মাউথলে ঘাস ভ'রে,—এখানে মাউথের নীচে শুয়ে আছি ঘাসের উপরে ;
কাশ আর চোরকাঁটা ছেড়ে দিয়ে কড়িং চলিয়া গেছে ঘরে।
সন্ধ্যার নক্ষত্র, তুমি বল দেখি কোন্ পথে কোন্ ঘরে যাব !
কোথায় উদ্যম নাই, কোথায় আবেগ নাই,—চিন্তা স্বপ্ন ভুলে গিয়ে শান্তি আমি
পাব ?
রাত্রের নক্ষত্র, তুমি বল দেখি কোন্ পথে যাব ?

'তোমারি নিজের ঘরে চ'লে যাও'—বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে
'অথবা ঘাসের পরে শুয়ে থাক আমার মুখের রূপ তার ভালোবেসে ;
অথবা তাকায়ে দেখ সোনালি গাড়ীটি ধীরে চ'লে যায় অন্ধকারে সোনালি
খড়ের বোঝা বুকে ;
পিছে তার সাপের খোলস, নালা, খলখলে অন্ধকার—শান্তি তার র'য়েছে সমুখে ;
চ'লে যায় চুপে চুপে সোনালি খড়ের বোঝা বুকে ;—
যদিও র'য়েছে সেথা গন্ধর্ব কিন্নর, যক্ষ—তবু তার মৃত্যু নাই বুঝে।'

স্বপ্ন

জীবনানন্দ দাশ

পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি
নিস্তব্ধ ছিলাম ব'সে ;
শিশির পড়িতেছিল ধীরে ধীরে খ'সে ;
নিজের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখী যামি

উড়ে গেল কুয়াশায়,—কুয়াশার থেকে দূর কুয়াশায় আরো।
তাহারি পাখার হাওয়া প্রদীপ নিভায়ে গেল বুঝি ?
অন্ধকার হাতড়ায়ে ধীরে ধীরে শেষ্ শাই খুঁজি ;
যখন জ্বালিব আলো কার মুখ দেখা যাবে বলিতে কি পার ?

কার মুখ ?—আমলকী শাখার শিহরে
শিশুর মতন যাকা নীল চাঁদ একদিন দেখেছিল তাহা :
এ ধূসর পাণ্ডুলিপি একদিন দেখেছিল, আহা,
সে মুখ ধূসরতম আজ এই পৃথিবীর মনে।

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ র'বে না আর, র'বে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন :
সেই মুখ আর আমি র'ব সেই স্বপ্নের ভিতরে।

হরিণেরা

জীবনানন্দ দাশ

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে

হরিণেরা ; কপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায় :
বাতাস কাড়িছে ডানা,—মুক্তা হ'য়ে যায়

পাখের চাঁদে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে ;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।

হীরের প্রদীপ জেলে মেকালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে ;—

বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর মেকালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

বাতাস কাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে ;—
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

মরুভূমিতে মৃত্যু

অলকা সমর সেন

কার নীল চোখে
এখনো সমুদ্রের গভীরতা কাঁপে,
ট্র্যামলাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর সহর।
আর এখনো আকাশের মরুভূমিতে
নিঃসঙ্গ পশুর মতো ট্রাম্প আসে,
ট্র্যামলাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর সহর।

রাত্রে, চাঁদের আলোয় শূন্য মরুভূমি জ্বলে
বাঘের চোখের মতো।

অকাল বসন্ত

মহাকাল আজ আমাদের সামনে কাঁপে,—
শোনো, দক্ষিণের হাওয়ায় শোনো,
নতুন জীবনের দুরন্ত রক্ত ;

বুনো ঘাসের দল রোদে-ভরা সমুদ্রের দিকে
তাদের শুভ্র ডানা মেলল :
সামনে ধূসর সমুদ্রের দীপ্ত দিন !
—আজকের হাওয়ায় শুনি শেষ শত্রুর পদক্ষেপ,
টুকরো টুকরো আশা আর আনন্দ আর শব্দের শেষে
অমৃত শত্রুর পদক্ষেপ ।

রামগিরিতে কতদিন

বয়সের অলস অন্যতায়
সূর্যের উজ্জ্বল বর্শা লাগল ;
সামনে স্বপ্নের মতো উঠেছে পাহাড়ের ঢেউ ।
আজো অলস খড়্গের মতো আকাশে
চাঁদ ওঠে,
আজো সামনে
মৃত্যুর মতো মন্থর জীবন ।

স্বর্গ হতে বিদায়

ম্লান হয়ে এলো ফুটপাথে
ইউনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ—
হে সহর হে ধূসর সহর
কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে সহর হে ধূসর সহর !
মূঢ় লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচো
দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী,
তখন সাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে,
অন্ধতের পুত্রের বুকে চির আত্মঘাতী
নাচে রক্তধারা
আর দিগন্তে প্রলয় চাঁদ ওঠে
হে সহর হে ধূসর সহর ।

'আমি নহি পুরুরবা হে উর্বশী',
মোটরে আর বাসে
আর রবিবারে ভাগলপুরপ্যাসেঞ্জারে
কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম,
তারপর সামনে শূন্য মরুভূমি জ্বলে
বাঘের চোখের মতো ।

১৯৩৩

সমুদ্র শেষ হল,
আজ দুরন্ত অন্ধকার টানা বাড়ে
উড়ন্ত পাখীর মতো,
সমুদ্র শেষ হল :
গভীর বনে আর হরিণ নেই,
সবুজ পাখী গিয়েছে ম'রে,
আর পাহাড়ের ধূসর অন্ধকারে
দুরন্ত অন্ধকার টানা বাড়ে
উড়ন্ত সাপের মতো।
সমুদ্র শেষ হল
চাঁদের আলোয়
সমস্তের মৃত মরুভূমি জলে।

মঙ্গলগুহের প্রার্থনা

মাস্তুলের দীর্ঘ রেখা দিগন্তে,
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূরে সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।

সমস্ত দিন কাটে দুঃস্বপ্নের মতো ;
রাত্রে ঘুমের প্রেম : মৃত্যুরের কারাগার ;
কতো দিন, কতো অন্ধকার, দীর্ঘ দিন,
কতো গোধূলি-মদির অন্ধকার,
কতো মধুবাতি রক্তসে গোঙাচ্ছে,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।

বিরহ

প্রতিভা বসু

তোমারে ভাবিয়া যবে অন্ধকার রাতে
আপনাকে কাটায়েছি তারাদের সাথে
দীর্ঘ বিরহ-বেলা কেটেছে তখন
ঈশ্বরের স্তুতির মতন।

ব্যথায় মূর্চ্ছিত, তবু মধুর মধুর
রোমাঞ্চের মত সেই বিরহের সুর
মর্ম্মরে ভরেছে মোর হৃৎপ্রের বন
ঈশ্বরের স্তুতির মতন।

আজ তুমি এত কাছে তারা-ভরা রাতে,
রাখিয়াছি ক্লান্ত হাত তব তপ্ত হাতে।
ক্লান্তির হৃদয়ে তবু বিরহ-স্পন্দন
ঈশ্বরের যজ্ঞের মতন।

পরিচ্ছেদ

প্রতিভা বসু

যাক্, যাক্,
এ নিয়ে ভেবে কী হবে ?
যে চাকায় তোমার জীবন চিরকাল ঘুরে চলেছে
সেই পূর্বমান চাকাতেই তুমি থাকো,
তা নিয়ে অভিযোগে আর অভিমানে
মনকে বিব্রত করবো
এমন সময় আমার নেই।
আমি ঘুরেই ম'রে যাই।
আমার সত্তা আর আমার নিঃসঙ্গ জীবন
সে তো কারো নয়—
তাই নিয়ে ঘুরে ম'রে যাই আমি
যেখানে তোমাকে দেখা যায় না
ছোঁয়া যায় না
ডাকলেও শোনা যায় না যেখানে—
দুঃখের যেখানে শেষ। সেই অন্ধ অন্ধকারে
মৃত্যুর অতল অন্ধকারে।

২

আমি যদি লিখতে পারতুম তোমার মতো
যদি বোঝাতে পারতুম আমার কথা,
তবে তুমি এমন ক'রে ছিঁড়তে পারতে না আমাকে
কাটতে পারতে না প্রতিমুহূর্তে টুকি-টুকি ক'রে
তোমার ঐ রক্তহীন
হিমেল ঠাণ্ডা নীরবতা দিয়ে—
যদি বোঝাতে পারতুম !

যদি বোঝাতে পারতুম আমার কথা
তবে তুমি আসতেই
তুমি আসতেই আমার বুকের অন্ধকার বেয়ে,
সেই অবরুদ্ধ নিঃসঙ্গ ঘরে
আমি শুনতুম তোমার পায়ের শব্দ
আশায় আর আশঙ্কায়,
আরক্ত হ'য়ে উঠতুম উত্তপ্ত উল্লাসে।
আর তুমি আমাকে নিয়ে যেতে
তোমার অপরূপ জ্যোতির্ময় জীবনে
যদি পারতুম
যদি বোঝাতে পারতুম আমার কথা।

একটি সূর্য্যাস্ত

বিজেন্দ্র মৈত্র

চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা এই স্থানগত হ্রদ
আকাশের মতো কালো এর জলের রঙ্
গভীরতম গভীরতার লক্ষিত রেখেছে ইতিহাসকে।
আলো যাবার পথ নেই। আকাশের মত কালো জল।
মধ্যাহ্নের সূর্য্য ঠিকরে পড়ে কালো পাথরের জলে।
বহুদিনকার ঘুমিয়ে পড়া এক নীরব আগ্নেয়গিরি।

আমি যখন দেখলুম এই নির্ব্বাক সমুদ্রকে
তখন এর বুকে বয়ে চলেছে জলন্ত আগুনের স্রোত;
আকাশ থেকে নেমে এসেছে সে আগুন নেভানো চিন্তার মতো
বিস্তৃত রঙীন শূন্যতায়। বসে রইলেম এই শ্মশানে।
পাহাড়ের পিছনে সূর্য্য নেমে গেল। তার কণিক স্পর্শ রেখে গেল
পাহাড়ের চূড়ায় গাছের মাথায়, ঝুলে-থাকা মেঘের অন্তরে অন্তরে।

তাজমহল

বিজেন্দ্র মৈত্র

তোমাকে দেখেছিলুম আগ্রা যাবার পথে।
তুমি উঠলে মাঝের এক স্টেশন থেকে,
চুকে উঠ্‌লেম। একেই তো আমি চেয়েছিলেম,
খুঁজেছিলেম প্রতি মেয়ের চোখে।
তুমি বস্‌লে আমার সাম্‌নাসাম্‌নি, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে,
তোমার চুলে লেগেছে অস্তগত সূর্যের আলো
ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে তোমার দুল।
তুমি চেয়ে রইলে গতিহীন দিগন্তের দিকে, অপলক চোখে।
শুধু একটা স্টেশন, তারপর তুমি গেলে নেমে
মৃদু অথচ শান্ত পায়ে, ফিরেও চাইলে না আমার দিকে।
সূর্য তখন অস্ত গেছে, পশ্চিম আকাশে শেষ রঙীন স্বপ্ন।
আমি নাম্‌লেম আগ্রায়।
প্রকৃত কথা বল্‌তে কী তাজমহল আমার ভালো লাগেনি
দেখতে পাইনি এর মধ্যে শাজাহানের অবিনশ্বর বিরহী আত্মা
দেখ্‌লুম যাদুঘর পূর্ণিমায় ও প্রতিপদের রাতে
যেন প্রাণহীন একটা জড় সৌন্দর্য।

ফিরে চলেছি আগ্রা থেকে পুরোনো পথে
বাইরে নিবিড় অন্ধকার, ট্রেন চলেছে হু-হু করে
গাছ পালা ঝোপ ভূতের মতো সামনে এসে সরে যাচ্ছে
নুনো জন্তুর মতো ভয় পেয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন।
হঠাৎ তোমার মুখখানি সূর্যের সোনা মাখানো
জ্বলে উঠ্‌লো তীক্ষ্ণ প্রদীপশিখার মতো
যেন ঘুমে ঝেঁপে আসা রাতের স্টেশনের আলো।
তুমি দাঁড়িয়ে আছ জ্বলন্ত কপাটনে।
মহাকাল সম্মুখে আছে ক্ষণিক স্তব্ধতায়।

যযাতি

বিষ্ণু দে

অনেক পাপের পরম তাপের বিষম বোঝা
অনেক দিনের অনেক জ্ঞানের চরম ক্ষতি
অনিকেত মনে যক্ষের কূট প্রশ্ন আনে।
তাইত কান্তারে ব্যাধভয়াহত পাহাড় খোঁজা
পাতালপুরীর আঁধারে তাইত প্রণয়রতি
নাটকীয়সুরে যযাতিশিরার প্রবল গানে।

বন্ধুত্বরায় অতিউৎসবে লেগেছে সোনা
শতসন্দিগ্ধ ঘুমকেতু তার অন্ত টানে
মরণ আহরি' আহারে বিষম দিবসনিশা
উপবাসোগ্র ধমনীশিরার প্রবল তৃষা
বিদ্রোহীদের রজনীতে তাই পরম তোলা
নাটকীয়সুরে যযাতিশিরার প্রবল গানে।

সন্ধ্যামণির সোনায় খনিতে আগুন লাগে
আকাশগঙ্গা ধূসর পিঙ্গল বালুকা ছাড়া
শনির কণিকা বৈষবাগ্নরে জীবনে হানে
মরণের ছায়া, করকোষ্ঠীর ছিন্ন মালা।
তাইত হৃদয় নির্দ্ধয়লোভে তোমারে মাগে
প্রায়মুমূর্ষু যযাতিশিরার প্রবল গানে।

মুখ

বুদ্ধদেব বসু

ঘোমটা টেনে দাও
ঘোমটা টেনে দাও তোমার মুখের উপর :
তোমার রূপ আমি সইতে পারিনে।

তোমার মুখ
নগ্ন, উৎসুক, সম্পূর্ণ-উদ্ভাসিত
যেখানে রক্তসাক্ষে বিদ্যুৎ
যেখানে ডানা কাপটাচ্ছে অদৃশ্য পাখি, আগুনের চেউয়ের মত তার
জানার ওঠা পড়া—
আমি তা কেমন ক'রে সইবো ?

তোমার কি ভয় করে না
ভয় করে না আমার কাছে এসে বলতে ?
ভয় করে না চোখ তুলে তাকাতে আমার দিকে ?
তোমার কি ভয় হয় না যে আমি ম'রে যাবো ?

ঘোমটা টেনে দাও
ঘোমটা টেনে দাও তোমার মুখের উপর—
তোমার মুখ আমাকে মারছে।

এত মধুর তুমি, এমন নরম—তোমার হাত
বার-বার আমার হাতের মধ্যে মিশে যেতে চায়,
গ'লে যেতে চায় মোমের মত আগুনে।
তোমার সমস্ত শরীরের সৌরভ আমাকে জড়িয়ে ধরে,
আমার সমস্ত আত্মাকে জড়িয়ে ধরে তোমার চুল,
আর তুমি—তোমার দুই চোখের উৎস থেকে
বাসনার তারাময় স্রোত আমার উপর ঝরিয়ে দিয়ে বলো—
মৃদুস্বরে, অর্ধস্ফুট ধ্বনি, তোমার ঐ ভাঙা-ভাঙা নরম গলায়
শুধু বলো—'কী ?'

তুমি কি জানো সেই মুহূর্তে আমি ম'রে যেতে পারতুম ?

তোমার মধুরতা, তোমার কোমলতা—
এর ভারের ভার আমি সইবো কী ক'রে ?

দুঃখ দাও
দুঃখ দাও আমাকে—
এই নববর্ষার ছোট-ছোট বৃষ্টির মত
ঝরালো দুঃখ আমার বুকের উপর নামুক :
যে-বৃষ্টিতে জাগে প্রাণের অঙ্কুর,
মাটি সবুজে হেসে ওঠে,
যে-বৃষ্টি আনিয়ে দেয় আশ্চর্য রামধনু
আকাশের প্রান্ত থেকে প্রান্তে।

ঘোমটা টেনে দাও।

স্ট্রাউলিঙের অনুসরণে

বুদ্ধদেব বসু

এ-ঘর থেকে ও-ঘর
আমি তাকে খুঁজে বেড়াই :
হঠাৎ চমকে উঠি—
বুঝি ও-আয়নায় পড়লো তার ছায়া।
বুঝি বালিসে তার চুলের বাসি গন্ধ ;
বুঝি দেয়ালের বাঁকা রোদে তার খোঁপার আবছায়া ছায়া ;
একটু আগে সে কি বসেছিলো এই সোফাটায়,
এইমাত্র উঠে গেলো, তার আঁচল
রান্নাঘরের দরজায় খিলখিলে উঠলো—
থেকে-থেকে চমকে উঠি।

এ-ঘর থেকে ও-ঘর
প্রেতের মতো আমি ঘুরে বেড়াই ;
প্রেতে-পাওয়া এই বাড়ি বোবা হ'য়ে আছে
স্মৃতির ভারের চাপে মূর্চ্ছিত।
আকাশে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সূর্য্যের পরিক্রমণ
সমস্তকে আলোয় করান্ত দিয়ে চিরে-চিরে যায়
এক-একটি মণিময় মুহূর্ত্তে
এক-একটি বাণীহীন প্রত্যাশায়।

নাম

বুদ্ধদেব বসু

দেয়ালে তোমার নাম লিখে গেছো
চুলের কাঁটা দিয়ে
ছোট দু' অক্ষর।

মনে-মনে বলি, ওদিকে তাকাবো না,
ও-পথে উত্তরতা।

বিছানায় শুয়ে কত ক্লান্ত হাতে
কী দেয়ালে নিজের নাম লিখেছিলে
ঐখানে—দেয়ালের গায়ে।

বলো, এখন আমি কী ক'রে ঘুমোবো?
এখন আমি তাকাবো কোনদিকে?

দেখেছি রাত্রে, ঘুম-ভাঙা চোখে
কতদিন আমরা দেখেছি
লাল-আলো-জ্বালা ট্যালিগঞ্জের ট্রাম
অন্ধকার পার হ'য়ে আসছে।

ঐ তো সেই রাস্তার বাঁক, গাছের সারিতে আধো-সুকোনো,
এই তো সারাদিন ধ'রে ট্রামের গোঙানি
সারাদিন ধ'রে ট্রাফিকের আর্তরোল :
কিন্তু আমার
আমার মন নিঃশব্দ,
নিঃস্পন্দ,
দাঁতে-দাঁত-চাপা মূর্ছায় নিশ্চেতন—
কেননা নিঃসাড় হ'তে যদি না পারি তাহ'লে উন্মত্ততা।

সেই যে তুমি লিখে গেছো
দেয়ালের গায়ে তোমার নাম,
ছোট দু' অক্ষর।

কার্তিক

বুদ্ধদেব বসু

ঘুমে স্তব্ধ, বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে স্তব্ধ নীরক্ত কার্তিক।
নিষ্ফল নিষ্প্রভ দিন, আকাশ পাণ্ডুর।
নিশ্চিন্ত নিঃস্রোত বেলা, পৃথিবীতে পীত পাণ্ডুরোগ।
নিশ্চিত মৃত্যুর মত
আসন্ন শীতের বেলা
দামামাগুড়ি দিয়ে চ'লে আসে;
শূন্যদিনে শূন্যমনে শুয়ে-শুয়ে
সহরের বিমর্ষ গোঙানি শুনি,
কাক আর কুকুরের ডাক;
সহরের মুমূর্ষু নিঃশ্বাস শুনি;
কিরাত-কার্তিকে কাক ডেকে-ডেকে
গৃহস্থের ঘরে-ঘরে নিয়ে এলো।
বিবর্ণ আকাশে
শুধু সেতে চুপ ক'রে থাকে
সারাদিন ধূসর শাপদ এক;
সারারাত্রি ধূসর শাপদ এক
হা-হা ক'রে চ'ষে-চ'ষে ফেরে
আকাশের অনাকার অন্ধকারে।

সমাপ্তি

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বয়স্যবিহঙ্গ বেলা কাটালাম উন্মন আবেশে।
উদ্‌ঘাটিয়া জনমুক্ত হৃদয়ের দ্বার
স্বপ্নের চলাচল করিলাম সহজ সরল।
দৃষ্টিহারা নেত্রপাতে দেখিলাম সন্ত্রস্ত আকাশে
এইমতো আর এক দিবসের ছবি।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টির বিলাপে
শুনিলাম সে-কণ্ঠের স্নেহসম্ভাষণ।
অর্গলিত বাতায়নে বাটিকার নিরর্থ আক্রোশে
বিচ্ছেদবিস্মৃত হিয়া বাখানিলো মূক অকথতা
নির্ব্বিকার নিরুত্তর রুদ্ধ বিধাতারে।

এলো সন্ধ্যা রিক্তবরিষণ;
দিনান্তের মুমূর্ষু বর্ত্তিকা
কবিকের অকস্মাৎ কৃত্রিম কচিতে
প্রাণের অন্তিম শক্তি অকাতরে দিলো নিঃশেষিয়া;
তারপরে অন্তরে বাহিরে
অন্ধকার বিস্তারিলো নগ্নপ্রাবরণী।

মনে হলো আশা নাই,
মনে হলো ভাষা নাই শিরায়িত ব্যর্থতা বলার।
মনে হলো
সঙ্কুচিত হয়ে আসে মরণের চক্রব্যূহ যেন।
মনে হলো রক্তচারী মূষিকের মতো
শাণিত অজ্ঞানতা কুড়ায়েছি এত কাল ধ'রে
ক্ষণিকের ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে;
এইবার ফুরায়েছে পালা.
যাত্রক যন্ত্রের কারা অবরুদ্ধ হলো অবশেষে;
এইবার উত্তোলিত সম্মার্জনীমূলে
পিষ্ট হবে অচিরাৎ অকিঞ্চন উদ্বৃত্তির ময়।

হাউই

স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

হাউইটা বারুদে ভরাট।
সাহস ক'রে কেউ তার মুখে আগুন দিতে পারে না।
তুমি বেপরোয়া,
ঝাঁচোলটা কোমরে জড়িয়ে
বাঁ হাতে সেটা আলগোছে ধরলে,
ডান হাতে দীপটি একবার ছুঁয়ে দিলে তার মুখে।
ঘর্ ক'রে হাউই নিমেষে উড়ল আকাশে,
আঁধারের কষ্টিপাথরের উপর
একটা সোনার রেখা টেনে দিয়ে,
পড়ল ঝ'রে হাজার তারায়।
তার পাকাটির দেহটা কোথায় গিয়ে পড়ল কে জানে!

এই তুমি হচ্ছ সেই তুমি,
যে আমাকে একটা ধূপের মত উস্কিয়ে দিল আকাশে।
দিয়েছিলে একটি মাত্র চুম্বন,
ঠিক ওই আগুনের ফুলিঙ্গের মত সলিতার মুখে।
তোমার কাছ থেকে সেই আমার বিদায় অভিসার
ঊর্ধ্বলোকে, বহ্নিসরণি ধ'রে।
হাজার তারায় করতে করতে ছুটে চলেছি,
ওই ত আমার কবিতার পর কবিতা তোমার উদ্দেশে।

আমার দেহ? সেই পাকাটিটা?
কোথায় প'ড়ে আছে কে জানে!
কে-ই বা তুমি, কোথায় বা আছ,
সে সংবাদে আমার প্রয়োজন কি?
তোমাকে প্রণাম, আমাকে মুক্তি দিয়েছ সুরের ভুবনে।

প্রশ্নের উত্তর

প্রভু গুহঠাকুরতা

জীবন-রহস্য নিয়ে
ঘাঁটাঘাঁটি, কথা-কাটাকাটি অনেক হয়েছে।
যে সূত্র, যার শেষ নেই
তারই খবর পাবে ব'লে
মরণ-পথের যাত্রীদল তবু
ভিড় করেছে আসা-যাওয়ার সঙ্গমে।

কেমন ক'রে আসা গেল,
কখন চ'লে যাওয়া হবে,
কেন বেঁচে থাকা, কেন পথ-চলা,
কেন ভালোবাসা—
এ সব ভাবনা আসে।
তত্ত্বজ্ঞানী বলে :
তুমি-আমি
পরমাত্মার টুকরো কিনা তাই।

বায়লজিস্ট্ বলে :
আমার এই প্রাণময়, অন্তর বাহির,
অস্থির খোলসটা,
ফুসফুসের স্পন্দনধ্বনি,

আমার ওই সূক্ষ্ম রসবোধ,
শরীরের মত দরকার,
রূপের পিপাসা, আর ভালোবাসার প্রচুর উৎপীড়ন—
সবই নাকি
খণ্ড-খণ্ড রূপে আছে
গোড়াকার প্রোটোপ্লাজমের অদেহী বিন্দুতে।
আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে
সব অন্ধকারের, সব প্রশ্ন আরম্ভের
আসল সংবাদই ঐ।

এ যুগের মনের দুয়ার খুলে দিল
হেকেল, ইয়ুং, বার্গেঁ, রাসেল্,
মারি স্টোপ্স্ আর হ্যাভ্লক্ এলিস্।
মস্থর ইতিহাসশাসনের খিড়কি ছিল
নিতান্তই মনগড়া;
অমৃতের যে-সন্তান
বেহাত করেছিল প্রচার
সে পথ হারিয়ে গেছে পথের বালিতে।

মিছে কেন জীবনের সূত্রগুলি মিথ্যায় জড়াবো?
কে না জানে
নারদি ফুলের কোরাণ্ডলির মতো
জীবনের বীজবিন্দু

শরতে শরতে
জন্ম-সূচনার গায়ে গায়ে
গোড়া হ'তে লেগে ছিল।

সেইজন্ত, সবই আজ চোখে পড়তে ধরা,
মায়া নয়, ছলনাও সে হ'তে পারে না।
প্রোটোপ্লাজমগুলি কিল্‌বিল্‌ করতে থাকে
একখণ্ড কাচের উপরে
যখনই চোখে মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে দেখি।
দেহের মন্দির ভ'রে আছে মাইক্রোবে,
মাইক্রোব বাহন হয়েছে তার দেবতার ;
সব বৈজ্ঞানিকরা মিলে
ভালোবাসার গোপন কথাটি বুঝিয়ে দিয়েছে।

কেন ভালোবাসি ?
কেনই বা ভালোবাসা ফিরে পাই,
কিসিয়ে দিই ?
আপ্‌-টু-ডেট্‌ ব্যাখ্যা আছে :
শরীরের কোনো-কোনো গ্ল্যাণ্ড্‌
রক্ত-তরঙ্গের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে
যখন চঞ্চল হোয়ে ওঠে,
তখন ভালোবাসা জেগে ওঠে প্রাণে।

শিরায়-শিরায় প্রেম-কোষগুলি ডাক দিয়ে বলে :
"জাগো, ভালোবাসা।"
জাগে ভালোবাসা।

নবীনপল্লীরা আজ
জীবনের ঘুই পায় বদল করেছে ;
যে পায় থেকে দূরত্ব-নদী পাড়ি দেয়ার শক্তি
করি জোগাড় ;
আর যে পায়ে গিয়ে চুকিয়ে ফেলতে চাই
পাওয়া-না-পাওয়ার সব হিসেবপত্র।

বিন্দু থেকে সুরু হয়েছিল যে সেতুটা
তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলাম না ;
যে আবেগগুলি শিরশিরিয়ে উঠেছিল
বার বার
অকারণ আনন্দে,
তার চলাচলের রাস্তাঘাট
চিনবার অবকাশ আর মিললোই না।

আরম্ভ হওয়ার কাহিনীটা
লেখা আছে যাদের নোটখাতায়,
সেটা তারাই পড়লো,
আমি পড়তে পেলাম না।

গদ্য-কাব্য

গদ্য-কাব্য নিয়ে সম্প্রতি পাঠকের মনে তর্ক চলছে। এতে আশ্চর্য্যের বিষয় নেই।

ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, মনকে দুলিয়ে তোলে—এ কথা স্বীকার করতে হবে।

তবু তাই নয়। যে সংসারের ব্যবহারে গদ্য নানা বিভাগে নানা কাজে খেটে মরছে কাব্যের জগৎ তার থেকে পৃথক। গদ্যের ভাষা-বিশিষ্টতা এই কথাটাকে স্পষ্ট করে, স্পষ্ট হোলেই মনটা তাকে স্বক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হোতে পারে। গেরুয়া বেশে সন্ন্যাসী আমাদের যে সে গৃহীর থেকে পৃথক, ভক্তের মন সেই মুহূর্ত্তেই তার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে—নইলে সন্ন্যাসীর ভক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হবার কথা।

কিন্তু বলা বাহুল্য সন্ন্যাসধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে নয় সেটা আছে তার সাধনার সত্যভাবে। এই কথাটা যে বোঝে, গেরুয়া কাপড়ের অভাবেই তার মন আরো বেশি ক'রে আকৃষ্ট হয়। সে বলে আমার বোধশক্তির দ্বারাই সত্যকে চিনব, সেই গেরুয়া কাপড়ের দ্বারা নয় যে কাপড় বহু অসত্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে, ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় তার আনুষঙ্গিক হয়ে।

সহায়তা করে দুইদিক থেকে। এক হচ্ছে স্বভাবতই তার দোলা দেবার শক্তি আছে, আর এক হচ্ছে পাঠকের চিরাভ্যস্ত সংস্কার। এই সংস্কারের কথাটা ভাববার বিষয়। একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পাংক্তেয় ব'লে গণ্য ছিল। সেই সময়ে আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার অনুকূলে। তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য্য।

এমন সময়ে মধুসূদন বাংলাসাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমানভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ এর ভঙ্গী পদ্যের মতো কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।

সংস্কারের অনিত্যতার আর একটা প্রমাণ দিই। এক সময়ে কুলবধূর সংজ্ঞা ছিল, সে অন্তঃপুরচারিণী। প্রথম যে কুলস্ত্রীরা অন্তঃপুর থেকে অন্যত্রে বেরিয়ে এলেন তাঁরা সাধারণের সংস্কারকে আঘাত করাতে তাঁদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা ও অপ্রকাশ্যে বা প্রকাশ্যে অপমানিত করা, প্রহসনের নায়িকারূপে তাঁদেরকে অট্টহাস্যের বিষয় করা প্রচলিত হয়ে এসেছিল। সেদিন যে মেয়েরা সাহস ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষ ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে পাঠ নিতেন তাঁদের সম্বন্ধে কাপুরুষ আচরণের কথা জানা আছে।

ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে আসছে। কুলস্ত্রীরা আজ অসংকুচিতভাবে কুলস্ত্রীই আছেন যদিও অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে তাঁরা মুক্ত।

তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী ব'লে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দ বহু দূরে লঙ্ঘন করে গেছে।

কাজটা সহজ হয়েছিল কেননা তখনকার ইংরেজিশেখা পাঠকেরা মিল্টন শেক্‌স্‌পিয়রের ছন্দকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দকে জাতে তুলে নেবার প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সমালোচকেরা এই কথা বলবেন যে, যদিও এই ছন্দ চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিটা পেরিয়ে চলে তবু সে পয়ারের লয়টাকে অমান্য করে না।

অর্থাৎ লয়কে রক্ষা করার দ্বারা এই ছন্দ কাব্যের ধর্ম রক্ষা করেছে, অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে এইটুকু বিশ্বাস লোকে আঁকড়ে রয়েছে। তারা বলতে চায় পয়ারের সঙ্গে এই নাড়ীর সম্বন্ধটুকু না থাকলে কাব্য কাব্যই হোতে পারে না। কী হোতে পারে এবং হোতে পারে না তা হওয়ার উপরেই নির্ভর করে, লোকের অভ্যাসের উপর করে না—এ কথাটা অমিত্রাক্ষর ছন্দই পূর্বেই প্রমাণ করেছে। আজ গদ্য কাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে গদ্যেও কাব্যের সকলপ্রকার অবাধ্য নয়।

অসাধারণী সৈরভও সৈরভ আবার সাধারণী সৈরভও সৈরভ—কোন্‌খানে তাদের মূলগত মিল? যেখানে লড়াই ক'রে জেতাই তাদের উভয়েরই সাধনার লক্ষ্য।

কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা,—পদ্যের ঘোড়ায় চ'ড়েই হোক্ আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক্। সেই উদ্দেশসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে

হবে। হাত হোদেই হাক, তা সে ঘোড়ায় চ'ড়েই হোক্ আর পায়ে হেঁটেই হোক্। ছন্দে লেখা রচনা কাব্য হয় নি তার হাজার প্রমাণ আছে, গদ্য রচনাও কাব্য নামধরলেও কাব্য হবে না তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।

ছন্দের একটা সুবিধা এই যে ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য আছে, আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ। সস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হোতে পারে কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়।

কিন্তু সহজে সন্তুষ্ট নয় এমন একগুঁয়ে মানুষ আছে, যারা চিনি দিয়ে আপনাকে ভোলাতে লজ্জা পায়। মনভোলানো মালমসলা যার নিয়েও, কেবলমাত্র খাঁটি মাল দিয়েই তারা জিতবে এমনতরো তাদের জিদ। তারা এই কথাই বলতে চায় আসল কাব্য জিনিষটা একান্তভাবে ছন্দ অছন্দ নিয়ে নয়, তার গৌরব তার আন্তরিক সার্থকতায়।

পদ্যই হোক্ পদ্যই হোক্ রসরচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ। গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। গদ্য-ছন্দবোধের চর্চা যাঁরা নিজেদের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্য-ছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলঙ্কারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে। অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান তৈরী ক'রে তুলবে এমন আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হোলেও কাব্য গদ্য হোলেও কাব্য।

সবশেষে এই একটি কথা বলবার আছে :—কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।

বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের—[illegible]সাধনে গদ্য কাজে লাগবে; কেননা গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়।

১২।১১।৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

সম্পাদক : সুধাংশু বসু [illegible] সহকারী সম্পাদক : সমর সেন :
[illegible] চিত্রাঙ্কন [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

কবিতা

দ্বিতীয় বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪৩ | তৃতীয় সংখ্যা

ইকনমিক্স

বুদ্ধদেব বসু

যখন হাসির ছলে
অভাবের দুঃখ,
তখনো কি স্বভাবখানা
নেইকো হ'তে রুক্ষ ?
শিখে এলেম সুবুদ্ধি ও
দুষ্ট ইকনমিক্সে,
তথ্যতাতেও অদ্বিতীয়—
নয় কি খানিক কমিক সে?
ইঁদুরটাও তো হাত-পা ছোঁড়ে
বাঙ্কে মরতে-মরতে,
তুচ্ছভাবে আমরা প'ড়ে
ইকনমিক্স গর্ভে।
অসহ্যতার তলায় পাতা
কত মস্ত থিওরি,
মূঢ় ইঁদুর ভাবলে না তা
দেখে আমরা শিহরি।

মনোবৃত্তি অতিরিক্ত
শিক্ষিত ও সুস্থ,
চক্ষু হ'লেও অন্ধসিক
দেখাতে হয় না কষ্ট।
কাস্‌চারের চূড়ায় ব'সে
রাগ করতেও জানে যায়,
ঈর্ষা যদি হঠাৎ ঠোসে
ম'রেই যাবো লজ্জায়।
অর্থনীতির শাস্ত্রমতেই
ঘটছে যে এই কাণ্ডটা
সে-কথাটা বুঝবে না এই
সমাজ-ভরা মুণ্ডটা!
উদরটাসর্বস্বই অতি হীনের
তলার দিকে আকর্ষণ,
তাইতো এমন সাধ্য কি তোর
স্বাধীনতার আকর্ষণ!
হায়রে কবি হায়রে,
অতি উচ্চ কাব্যচর্চা
তাতেও কিছু অর্থব্যয়চা,
ভিতরটাতে হা-হা করুক,
হাসতে হবেই বাইরে।

যদি এ-সব সত্যবাণী
লাগে ঈষৎ বিদ্‌ঘুটে,
ধ্বংস করো, মক্কিরানি,
কটাক্ষের বিদ্যুতে।
মক্কিরানি, চক্ষে তোমার
অশিক্ষিত মুক্তি,
প্রজ্বলিত কল্পনার
অসংযত ফূর্তি।
বিশ্বজয়ী দস্যুতার
দুঃসাহসী বণিক সে,
দেখনি বন্ধ বৈজ্ঞানিক
ক্ষুদ্র ইকনমিক্সে।
মক্কিরানি, মুক্ত করো
যৌবনের বস্ত্রাঞ্চল,
যায় যাক্ দুষ্কৃতরো
সুবুদ্ধির দৈন্যদল।
নিয়ম মেনে বিশ্ব চলে
বিধাতাও তো গণিতকার,
তোমার চোখে আগুন জ্বলে
বড় মোহ ক্ষণিক তাঁর।

সুখদুঃখ তুচ্ছ অতি,
সবই হচ্ছে সিন্‌টেমে,
তাই পৃথিবীর অগ্রগতি
চলছে পুরো ইস্টিমে।
তুমি রঙিন সাড়ি পরো
রক্ত আছে কি ওরই ?
তার মধ্যেও মস্ত বড়ো
ইকনমিক থিওরি।
মক্কিরানি, শুধু তোমার
চক্ষে জলে মুক্তি,
যৌবনের, যন্ত্রতার
অসম্ভবের ভুক্তি।
এই তো রানি, এই তো !
চোখের চাপা উৎস খোলো,
বিদ্যুতের ঝলক তোলো—
অঙ্ক যতই হোক্ না অঙ্ক
কোনো শঙ্কা নেই তো।

গুহার গান

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রভু !

তোমার মাথায় পড়ে স্বচ্ছ শুভ্র রাতের কণিকা।
তোমাকে রয়েছে ঘিরে আঁধারের নীরব আলোক।
আমি আছি অতল গুহায়।
বুকের উপর চেপে রয়েছে অজ্ঞতা
গভীর সে রাত,
তুষীকৃত পাহাড়ের সমাধির মত।
আমি যেন শুনতে পাই আমার এ সমাহিতি হতে
নরম রাতের চূর্ণ বিন্দু-বিন্দু ঝরে,
কালো আঙুরের মত গুচ্ছ-গুচ্ছ
তোমার ও-চুলে।

প্রভু !

তোমার বিশাল হাত আমাকে ফিরেছে খুঁজে, জানি,
শিকারী হাতের ছায়া কেঁপে গেছে দেহের উপর।
আমার বুকের রক্ত হয় নাই এখনো ত হিম।
এক বিন্দু উষ্ণতায় যদি জ্বলে জীবন আমার,
এক বিন্দু চোখের আভায়
এ বন্ধন মধুই আমার।

প্রভু

তোমার মাথার 'পরে অর্ঘ্য পড়ে
অনাদি রাতের।
তার ঘন দুরভির ভরে
আমার অসাড় ঘরে করে করাঘাত
চ'লে যায় গ্রহলোক পানে।
আমি থাকি প'ড়ে অসহায়।
পক্ষাঘাত দুর্ভেদ্য প্রহরী।
তোমার কুঠারে চূর্ণ ক'রে দাও মোরে।
দুহাতে ছড়িয়ে দাও রাতের আকাশে।
আমার এ গুহাকাশে বজ্র হানো, প্রভু
রক্ত হোক আমার এ শব।

জাতক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

বহুদিন আগে,
যখন মানুষ ছিল ছেলেমানুষ,
আর, গাছপালাগুলো
ছিল সহরের লোক—
(তুমি বিশ্বাস করবে না)
তখন কুমারী আকাশটার কথা
শুনেছ কেউ ?
ইন্দ্রধনুর বর্ণ ছিল
সারা আকাশটার গায়ে,—
ভিজে মন—,
তারাদের বল ছিল পাখী ;
তাদের ডানায় এখনও তাই কত রং !
আজ তারা মর্ত্যে নেমেছে।
আর, তাদের পুরোনো ইচ্ছাগুলো
টুকরো টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে প'ড়ে
আছে উপরে।

তখন তুমিও ছিলে না,
আমিও ছিলাম না, সুরমা,
আকাশের মুখ চেয়ে।
আজ মানুষ পালিয়ে এসেছে,
আমিও এসেছি
জোলিমাজের যুগ থেকে
হাজার হাজার বছরের পথ বেয়ে,
সমুদ্রের তলে অন্ধকার আওলা-ঢাকা পথ,
কাঁকরের রাস্তা,
পাথরের রাস্তা,
ইটের রাস্তা
আর পিচের রাস্তা বেয়ে,
তোমার কাছে।
তোমার বাগানের এক কোনে
ছোট্ট জাতিম গাছ,
গন্ধে উঠেছে ভ'রে।
আর দেখেছি
গোল্ড মোহরের ফুলগুলি সোনা হয়ে
রোজ সকালে
রোদ্দুরের আগুন দিয়ে।

যুঁই ফুলের ঝাড়গুলোর নিচে
মরা ফুলের স্তূপ,
ফুলগুলী বয়সের মত জ'মে গেছে।
এই বাগানে বাসা বেঁধেছি, সুরমা

আমার সেই পুরোনো, ছেলিমাছের আস্তাকে ঘিরে
গ'ড়ে উঠেছে দেহ
শিরা উপশিরায় ঢাকা,
যেমন গ'ড়ে ওঠে প্রাচীন ভগ্নস্তূপের উপর
উইয়ের ঢিপি।
তোমার বেণী লম্বিয়ে নামে জান্‌লা বেয়ে
দেখ্‌তে পাই,
আর তোমার বেণীর সলিল কণাগুলোর
উদ্যত আগ্রহে
আমার বুকের রক্ত জমাট বাঁধে;
আর তাই জানলার নিচে,
অসংখ্যের চাহাটকে খুন্ করতে ইচ্ছে করে।

সন্ধ্যার সময়
যখন আকাশের মুখ,
হ'য়ে ওঠে ঘুঘুর বুকের মত
নরম আর গোলাপি,
তখন তার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন্ রূপকথাকে খুঁজে বেড়াও জানি না।
—দেখছি আকাশকে তোলো নি!

শুনে হয়ত হাসবে,—
তোমার চোখের স্পর্শ-লাগা আকাশ,
গুঁড়ি মেরে ঢুকেছে
আমার বুকে।
রক্তপিণ্ড ছড়াচ্ছে নীল রক্ত।
ছাতের আলসে থেকে,
তুমি দেখ, কালো পিচের রাস্তা দিয়ে
লাল রক্তলোলুপ বাসগুলো ছুটছে;
ঘুরে, জাহাজের হুইসে,
হরিণীর মত ওঠো চমকে।
আর আমি খুঁজে ফিরছি
কাটলগুলো
তোমার বাড়ির আনাচে কানাচে।

সনেট

("When by thy scorn, O' murd'ress, I am dead"—)

Donne

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

বৈশাখের দাবদাহ ক'রে দিক চোখে,
স্পর্শ-তিক্ত শালপেরা পুড়ে হোক ছাই।
কামনার সৌধচূড়া প্রলয় আলোকে
মুমূর্ষু ও শোকাতুর। আজ ক'রে যাই
বিস্মৃতিতে দুরন্তের স্বপন-কুসুম।
যৌবনের মন্ত্রমুগ্ধ দ্রাক্ষারস তুলি'
দেহ ভরি' পান করি মৃত্যু-নীল ঘুম।
করবীর মেঘ হতে বজ্র লহো তুলি'
হানো এই তপোদগ্ধ শীর্ণতার বুকে,
নিষ্ঠুর ধূলির পাত্রে ভস্ম যাক্ উড়ে।
প্রেতের দুরূহ পথে নেমে যাবে সুখে
গহন পাতালে। তবু ছায়াপথ ঘুরে
পাঠাবো বেদনা রাত্রে তোমার শিয়রে,
দুঃস্বপ্নের খড়্গ যাবো রাখি বক্ষ 'পরে।

ডি, এইচ্ লরেন্সের
কয়েকটি অনুবাদ

বিষ্ণু দে

১

সন্ধ্যা। স্থির পাহাড়ের সামনে অস্পষ্ট ঐতিহ্যের কিস্তে,
তার আর আমাদের মধ্যে যন্ত্রের যাওয়া-আসা।
নিচে সবুজ ক্ষেতে মজুররা দাঁড়িয়ে
কালো খামের মতো, সবুজ যবের ক্ষেতে নিশ্চল।

তুমি আমার পাশে, তোমার খালি পায়ে সাণ্ডাল্
বারাণ্ডার কাঁচা কাঠের গন্ধের মধ্যে দিয়ে ভাসছে
তোমার চুলের গন্ধ আমার কাছে :
ঐ আসছে
আকাশ থেকে পড়ল এসে বিদ্যুৎ।

ক্ষীণ সবুজ বরফগলা নদীতে কালো নৌকো
অন্ধকার কেটে-কেটে—যায় কোথায় ?
যন্ত্র থেকে ওঠে। কিন্তু আমরা তো এখনো
পরস্পরের।
উজল বিদ্যুৎ আকাশে খেলে-খেলে চলে' যায়।
—আমরা ছাড়া আর কিই বা আছে আমাদের ?
নৌকোটা গেলো চলে'।

২

বাংলোয় নীরবতা, রাত্রি গভীর, আমি একা
বারান্দায়
শোনা যায় তিস্তার আর্তনাদ, দেখা
যায় সাদা নদীটির ভাঙা হাড় প্রেতচ্ছায়ায়
পাইনের ফাঁকে-ফাঁকে, পাথরের আকাশের গায়ে।
থেকে-থেকে গোটাকয় জোনাকপোকার অস্পষ্ট অসাড়
ঘুরে দিশে যাওয়া।
ভাবি শুধু কোথা নিশি-পাওয়া
সর্বগ্রাস বিলুপ্তির অন্ধকারে আমার নিস্তার ?

৩

না, না, এই রৌদ্র এবারে থেমে যাক্
চুনকামে ঝকঝকে বাড়িগুলো আর বারান্দার টক্‌টকে ফুলগুলো
আর ঘুমের ঐ নীলিম পাহাড়গুলো দিয়ে যাক্
অন্ধকারের ঘুটো সেপ্টিপিণের চাপে।
অন্ধকার উঠছে, অন্ধকার পড়ছে, তার চাপা আওয়াজে
সর্বস্ব মুছে দিয়ে-দিয়ে।

আলোর দেয়ালের ভিৎ ধ্বসে' যাক্, ধ্বসে' যাক্
আর অন্ধকারের পাথরগুলো ঘুড়মুড় করে' নেমে আসুক
আর সব চিরকালের মতো হ'য়ে যাক্ ঘন কালো অন্ধকার।
ঘুম নয়, স্বপ্নে ঘুমের সে ঘুম,
মৃত্যুও নয়, নবজন্মের সম্ভাবনায় সে স্পন্দমান,
শুধু তারি, বিশ্ব-ভোরানো অন্ধকার, নিস্তব্ধ, নিশ্চল।

ঘুম ? ঘুমে কি হবে ?
পাহাড়ের উপর চলন্তি মেঘের ছায়া, আমার উপর ভেসে যায়,
সে আমায় বলায় না, দেয় না কিছুই।
আর মৃত্যুও নিশ্চয়ই বাকি রেখে যাবে একটু বেদনা,
সেও ত যৌনযন্ত্র, অস্থির।
একেবারে অন্ধকার হোক্ সব অন্ধকার
আমার ভিতরে, আমার বাইরে একেবারে
ঘন তারি অন্ধকার।

৪

আমাদের দিন হলো গত,
রাত্রি উঠে আসে ঐ।

পৃথিবীর গর্ভ ছেড়ে চুপিসারে উঠে আসে
আঁধার ছায়ারা
আঁধার ছায়ারা
ঘুরে দিয়ে যায় আমাদের হাট
ঝিঁঝিরে দিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে আমাদের উরু।
আমাদের দিন হলো শেষ।
কাপা ভেঙে ঠেলে-ঠেলে আমরা চলি
পাথরের ফাকে-ফাকে টলতে-টলতে পড়তে-পড়তে চলি।
ভূবনমুখ আমরা।
আমাদের দিন হলো গত
রাত্রি উঠে আসে ঐ।

৫

লেডা

এসো নাকো বহিয়া চুম্বন
দুই বাহু ওষ্ঠাধরে গাঢ় আলিঙ্গন
বহিয়া অস্ফুটস্বর মধুর গুঞ্জনে
এসো তুমি পক্ষ-বিধুননে
সমুদ্রের হর্ষ বহি চঞ্চুর আঘাতে
এসো তুমি ভয়ঙ্ক-সঞ্চারী
সিক্ত তব তন্তুপদপাতে
জলাভূমি-স্তকোমল উদরে আমার।

৬

আনো বিপ্লব বিদ্রোহ কেউ ভাই
অর্থভাগের অনর্থে নয়
অর্থলোপের একান্ত দুরাশায়।
আনো বিপ্লব যাহোক্ একটা ভাই
শ্রমিকের নব-অভিষেক চেয়ে নয়
শ্রমিকের পাট একেবারে তুলে দিতে
আর রচনা করতে শুধু
মানুষেরই নব স্বর্গাখচিত দেশ।

৭

কবে তুমি শেখাবে তোমার জনগণকে
অমোঘ ন্যায়ের হে অমর দেবতা! নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই করতে?
কতবার ও তারা উদ্ধৃত হল
কতবার উপজীবিত।

অমোঘ ন্যায়ের হে অমরদেবতা! পাঠিও না আর
জনগণ-উদ্ধারের অবতার।
একদা এক অবতার এলেন, করলেন উদ্ধার।

তারা দেখলে যে তারা তাঁর অমৃতপিতার কাছে হয়ে গেছে
বড়কী তমস্তুক।
তারা বললে, উদ্ধার ত করলে প্রভু
এদিকে যে উপবাস।
তিনি বলেন, তালোই ত যে,
ওদিকে তত্তই ঘনিয়ে আসছে
আমার পিতার উনপঞ্চাশমহলা প্রাসাদে তোদের
কল্পপায়সান্নের ভোজ।
তারা বলে, প্রভু একটু মোটা পাকান্নও যদি—
তিনি বলেন, ছিছি
কোথায় সেই বৈকুণ্ঠের পায়সান্ন খাওয়া
আর তোরা চাস্ কিনা—

তারপরে ধরো নেপোলিয়নে
বলেন, আমি ত তোমাদের খালাস করলুম
অতীত আমলের আমূলমামূল ইজারা থেকে।
তোমরা হুড়াহুড়ে আজকে আমার,
প্রস্তুত করো জীবনমরণ তোমাদের
আমারই তরকে।

হয়তো তারপরে আসেন গণতান্ত্রিকরা,
বলেন, তোমাদের উদ্ধার হল আজ,
তোমরা আমাদের উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্ত পুঁজি
এবারে কলকারখানায় আর ধাতিল্যে বসতে লক্ষ্মী।

তারপরে লেনিন হয়তো বা,
বলেন, তোমাদের উদ্ধার সমাধা হল
একেবারে সাইকারি উদ্ধার।
তোমরা আর মানুষ নয়, সেটা বড় বুঝে নিয়ো
তোমরা সোভিএট রাষ্ট্রই একমাত্র হিসাবনিকাশ, মনে রেখো
তোমরা সব সে হিসাবে এক এক দফা শুধু,
দফায় দফায় কিছু আসে যায় না।
এই ত চলেছে চিরকাল, লোক উদ্ধারের পেশা
হে স্বাধের দেবতা, কবে এদের শেখাবে
আত্মউদ্ধার?

নির্জন অলস মধ্যাহ্নের সুর

হেমচন্দ্র বাগচী

মধ্যাহ্নের অলস সুর।
ঘন সন্নিবিষ্ট পাতার উপর এসে পড়েছে
প্রদীপ্ত রৌদ্র।
ঘনতলে আলোছায়ার খেলা
শ্যামল দূর্বার উপরে লাখ কীটপতঙ্গের মেলা।
একটা হলদে রঙের পাখী
পত্রবহুল কাঁঠাল গাছের ঘনতার মধ্য থেকে ডাকছে ক্রমাগত
চোখ্ গেল চোখ্ গেল।
তার সেই সুর ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে উচ্চতর হ'য়ে উঠছে—
নির্জন অলস মধ্যাহ্নের সুর

সাধ যায় অসুস্থ শরীর ও মন নিয়ে
ঐ শ্যামল দূর্বার উপরে প'ড়ে থাকি কিছুকাল—
শ্যামল দূর্বার স্নিগ্ধ স্পর্শ
আর মনের স্নেহশীতল মর্মরধ্বনি।

চেয়ে চেয়ে দেখি—
নেবুর ফুল এখনো ঝরে নি।
নেবুফুলের গন্ধের সঙ্গে আসে
অনাদিকালের বিরহরাগিণী।
নির্জন অলস মধ্যাহ্নের সুর।

চেয়ে চেয়ে দেখি—
পশুমিথুনের লীলাবিলাস—
তাদের বনচারী কণ্ঠের তীব্রধ্বনি।
আর পুচ্ছের দ্রুত আন্দোলন,
বনতলের আধ আলো আধ ছায়ার মধ্যে
তাদের মূর্তিগুলির সুস্পষ্ট রেখা,
সজল আয়ত চক্ষু,
ওদীপ্তে জীবনের পরিচয়।

সাধ যায় দেখি
এই জীবনের চিত্র,
চোখের উপরে একটি বিস্তৃত মুগের ছায়া ঘনায়—
অপাবন,

আসবাবে জলসেচন,
দিনকাতর দুষ্কৃতের বিলাপধ্বনি,
অতিপিনদ্ধস্তনী কবিকন্যাদের যৌবন-বেদনা।

আর দেখি,
মর্মরিত দেবদারুবনচ্ছায়ে
আয়তচক্ষু কৃষ্ণসারমৃগের করুণ প্রেম নিবেদন।
স্বপ্ন ভেঙে যায়,
দেখি, সে দিন শেষ হয়েছে—
এখন শুধু অনবসরের কাহিনী।

প্রেম? সময় নাই।
দয়া? সময় নাই।
ক্ষমা? সময় নাই।
হরিণীদের আয়তচক্ষুর বিভ্রম
বেদনায় নিপীড়িত হ'য়ে ওঠে।

• • •

অনেকদিন ধ'রে একটি পাখী
ক্রমাগত ডাকছে—

•

পুঞ্জবহুল কাঁঠালগাছের মধ্য থেকে
চোখ্ গেল চোখ্ গেল—
তার ডাক শুনি
আর চেয়ে চেয়ে দেখি
ঘনসন্নিবিষ্ট পাতার উপরে এসে পড়েছে
প্রদীপ্ত রৌদ্র।
মধ্যাহ্নের অলস স্বর বাজছে
তারি সঙ্গে ক্লিষ্টসুর মেশে আসছে
মাস্তিকলপত্রের উদাস ঝিমিরঝনিতে—
নির্জন অলস মধ্যাহ্নের সুর।

শ্রাবণরাত

জীবনানন্দ দাশ

শ্রাবণের গভীর অন্ধকার রাতে
ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙে যায়
কোথায় ঘুরে মহোৎসাগরের শব্দ শুনে ?

বর্ষণ অনেকক্ষণ হয় থেমে গেছে ;
যতদূর চোখ যায় কালো আকাশ
মাটির শেষ তরঙ্গকে কোলে ক'রে চুপ ক'রে রয়েছে যেন ;
নিস্তব্ধ হয়ে দূর উপসাগরের ধ্বনি শুনছে।

মনে হয়
কারা যেন বড় বড় কপাট খুলছে,
বন্ধ ক'রে ফেলেছে আবার ;
কোন দূর—নীরব—আকাশরেখার সীমানায়।

বালিশে মাথা রেখে যারা ঘুমিয়ে আছে
তারা ঘুমিয়ে থাকে :
কাল ভোরে জাগবার জন্য।

যে সব ঘুমের হাসি, গল্প, প্রেম, মুখরেখা
পৃথিবীর পাথরে কঙ্কালে অন্ধকারে মিশেছিল
ধীরে ধীরে জেগে ওঠে তারা ;
পৃথিবীর অবিচলিত পঞ্জর থেকে খসিয়ে আমাকে খুঁড়ে বার করে।

সমস্ত যজ্ঞসাগরের উচ্ছ্বাস থেমে যায় যেন।
মাইলের পর মাইল মৃত্তিকা নীরব হয়ে থাকে।

কে যেন বলে :
আমি যদি সেই সব কপাট স্পর্শ করতে পারতাম
তাহ'লে এইরকম গভীর নিস্তব্ধ রাতে স্পর্শ করতাম গিয়ে।—
আমার কাঁধের উপর কাপস্য হাত রেখে ধীরে ধীরে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে।

চোখ তুলে আমি
দুই তার অন্ধকারের ভিতর ঘুমের মেঘের মত প্রবেশ করলাম :
সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম।

বিড়াল

জীবনানন্দ দাশ

সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলই আমার দেখা হয় :
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, ঝাপালী পাতার ভিড়ে ;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মত নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি ;
কিন্তু তবুও তারপর কুকচুচার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্য্যের পিছনে পিছনে চলছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্য্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মত থাবা দিয়ে লুফে আনল সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

অকৃতজ্ঞ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আমার মৃত্যুর দিনে কৌতূহলী প্রশ্ন করে যদি—
দাবিলাম কী সুকৃতি, হবো যার প্রসাদে অমর ?
মেনে নিও মুক্ত কণ্ঠে, সেই মোর পাপের অবধি ;
সারা ইতিহাস খুঁজে মিলিবে না হেন স্বার্থপর।

অজস্র ঐশ্বর্য মোরে অর্পিয়াছে সমুদার বিধি ;
ভুঞ্জেছি নিষ্ঠুর মনে সে-সকলি প্রাণপণ ভেবে আমি।
পেয়েছি অমিত্র সুধা আবিষ্কিয়া কালের বাদিনি ;
করেছি তা আস্বাদন, শুধু বিষ কণ্ঠে দেছে থামি।

দেখেছি এ-দরচক্ষে নটরাজ মহাশূন্যে নাচে,
শুনেছি শ্রবণে কানে সে-নক্ষত্রনূপুরের ধ্বনি ;
তথাপি আমার বীণা বাজায়েছে বেসুর পিশাচে,
অধরায় অনুনাদে সাড়া কভু দেয় নি ধমনী।

ফাল্গুন অঙ্গনে মোর ছড়ায়েছে অশোক পলাশ।
দক্ষিণের বাতায়নে রুক্ষচূড়া হেনেছে বৈশাখ।
আষাঢ়ে মেদুর মেঘে চপলার চকিত বিলাস
বিকচ কদম্বচুম্বে আষাঢ় দিয়েছে মোরে ডাক।

সেকালীয়ঞ্জিত হতে নবাহের নৈবেদ্য এনেছে
অতিক্রান্তি কাশবন সিতাম্বর শ্যামল আশ্বিন।
কাননে ছড়ায়ে সোনা উদাসী অঘ্রাণ চ'লে গেছে।
পউষের অভ্যাচারে সর্ব্বহারা হয়েছে বিপিন।

তথাপি অভাব মোর মিটে নাই মুহূর্ত্তের তরে;
অপব্যয়ী প্রকৃতির অলক্ষিত দানসত্র হতে
অপহরি মহাবিত্ত আনিয়াছি বৎসরে বৎসরে
অন্তর্ভৌম কোষাগারে মজলুম মুক্তের পথে।

কিন্তু সে-ঔদার্য্য দেখে হয় নাই কার্পণ্য লজ্জিত,
সন্দেহের অবকাশ পায় নাই মৃদুতা আমার;
ফিরেছি ধনীর দ্বারে অপলাপী চৌরের সজ্জিত,
বলেছি নাটকী স্বরে—বিশ্বে শুধু সত্য অবিচার।

অন্তরঙ্গ সখাসম ফুলধনু আমার ইঙ্গিতে
লুটায়েছে পারিজাত হিমেরুক তুঙ্গ তপোবনে;
অরন্ধরা শৈলসুতা এসেছে কৌমার্য্য নিবেদিতে।
টুটেছে দুঃস্বপ্ন মোর ব্রহ্মাণ্ডের শতলাচরণে।

তবু মোর নীলকণ্ঠে উঠে নাই কালোর ঝঙ্কারি,
অনন্ত্যন্ত রসনায় উৎসারিত হয়নি দীপক।
মোর প্রিয়সম্ভাষণে বিরহের আশঙ্কা সঞ্চারি
অন্তরের দ্বার রুদ্ধে হেসেছে অগ্নীল বিদূষক।

সোপন বৈভব আমি ব্যক্ত কভু করিনি প্রিয়ারে ;
মুক্তি নাই বিনিময়, বিনা-বরে ফুরায়েছি পূজা।
অতিব্যস্ত ক্ষুধা মম অবরোধে ঘিরেছে তাহারে,
পরিতৃপ্তি বিতরিতে পারেনি স্বয়ং দশভূজা।

নিমেষ না-যেতে তাই ফুরায়েছে প্রথম আবেশ,
উন্মীলিত বিলোচন অলিয়াছে বিপ্রলব্ধ লোভে,
অচিরাৎ সে-আগুন কামেরে করেছে ভস্মশেষ ;
অপর্ণা সেজেছে চণ্ডী আমাহিতে মোর উপভোগে।

কেবলি চেয়েছি আমি, কভি কভু ছোঁয়নি আমারে,
কোনোদিন বক্ষাঘাতে সর্ব্বস্বান্ত করেনি উর্ব্বশী ;
মোর তারাদীপাবলী মূলাধার আমার ফুৎকারে
কখনো যায়নি নিবে, ধ্বংসমুক হয়নি ত্রুক্ষসী।

শিখিনি কখনি আমি, কামা যার নিশ্চিত অমরা,
অনির্ব্বাণ মুক্তীপাকে ঘুতে হয় তাহারে নিষাদ।
তবুই জ্বালাতে তাই ভরিয়াছি প্রাণের পসরা,
গায়ত্রী জপেছি, কিন্তু শোনা গেছে বিরর্থ নিনাদ।

আমার মৃত্যুর দিনে তাই যদি অলস জিজ্ঞাসু
মুখে সবপরিচিতি, বিনা-তারে বোলো তারে, সখা,—
জগতের কোনো কাজে লাগেনি এ-অখ্যাত গতায়ু,
যায়নি অনাত্ম ক'রে কোনো যৌন হৃদয়-অলকা।

শীতলপাটি

যুবনাশ্ব

চিকন শীতলপাটিটি বিছানো দখিন-দুয়ারী ঘরে,
গাল তারি 'পরে,
মাথার বালিশ তখন গিয়েছে সরে।
এ পাশে পড়ার হালের প্রবাসী,
এলোমেলো, পাতা খোলা।
পড়ন্ত বেলা, এখনো ঘুমোয় আপন ভোলা।

শাড়ির আঁচল গায়ে নেই,
নেই খোঁপায় ফুলের কাঁটা।
থরথর কাঁপে চম্পকাধর দিনের দুঃস্বপনে।
যদি ভোর হয়
পরে মাপ চেয়ো, না হয় চেয়ো না ক্ষমা।
এখন ত আমি ওষ্ঠপ্রান্ত এঁকে দেব চুম্বনে।

গালেতে পাটির লেগেছে দাগ,
ঠোঁটেতে আমার চুমো।
চোখের প্রশ্ন, ভালোবাসি কিনা,
কাল হবে।
আজ ঘুমো।

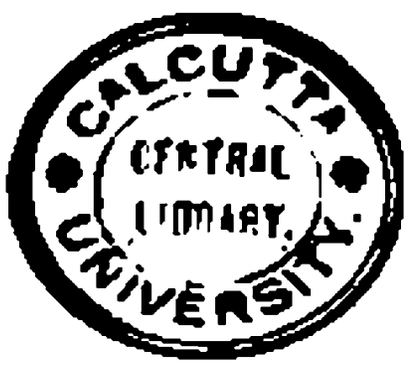

প্রশস্তি

সুরেশ্বর শর্মা

আমার আকাশে যবে বর্ত্তমানে হেরি অস্তরাগ,
অনাগত ভবিষ্যের অরুণিমা ভরুণের মুখে
নেহারি প্রত্যাশাপূর্ণ মুগ্ধ নেত্রে, জাগে পূর্ব্বরাগ
আমার মুমূর্ষু প্রেমে অভিনব দুঃখে আর সুখে।
এ জীবনে রহিল যা স্বপনের আকাশকুসুম,
তার প্রস্ফুটিত শোভা হেরি আমি আগামীর পটে,
পূর্ব্বাশার গিরিশৃঙ্গ হ'তে যেন আবীর কুঙ্কুম
মুঠি মুঠি উড়ে আসে আমার পশ্চিম গিরিতটে।

হে অরুণকুসুমকান্তি নবরবি, করে নমস্কার
তোমারে অন্তিম সন্ধ্যাতরলীন অপরাহ্ণমান
আমার নির্ব্বাণমুখী অস্তরবি, হর্ষে কম্পমান
বুক করে; প্রসারিয়া জীবনাহ্ন আশীর্ব্বাণী তার
জানাই তোমারে আজি, জীবনের শেষ স্নেহাঞ্জলি
লহ শিরে, ওঠ জাগি দীপ্ত তেজে ভুবন উজলি'।

মুক্তি না মৃত্যু

অনুপম গুপ্ত

সন্ধ্যা নামে ধীরে।
অস্তমিত তপনের ম্লান আভা
প্রকৃতির দৃশ্যপটে ধরে মায়া মরণ-রঙের।
দূরে আকাশের গায়ে লঘু মেঘগুলি
ক্ষণিক মুহূর্তটিরে মিশে করে খেলা
চৈত্রের চপল বায়ে।
উদ্ভাসিত মায়াবী বিতান—তারই ক্ষিপ্র ছায়ে
সাধ করে রাত্রি-ভ্রমে বিরহ সন্তাপ।
এই ভাবে, মুক্তি চলে
দিবা মরে রজনীর ভস্ম মাখি'।
অজানার উৎস হ'তে উচ্ছ্বসিয়া উঠি'
যেমনি সর্পিল স্রোত মহাকাল-সাগরের দিকে
সতত চলেছে বহি'।
তরুণ রবির স্পর্শ মাখি' যত ফুলগুলিরন
মুক্তি মাগি' যেমনি পল্লব
তারেরি মৃত্যুর ভয়ে
নিত্য এই স্রোতস্বতী চলেছে বহিয়া।

তাই ভাবি, মুক্তিস্নিগ্ধ যত জীবনেরে
উৎসর্গিয়া উন্মার্গ-মৃত্যুর মন্ততায়
এ কী রহস্যের লীলা নিরন্তর খেলিছে প্রকৃতি !

আমি কবি যন্ত্রণের অধিচ্ছেদ কারাগারে ব'সে
হেরি যবে এই খেলা, প্রকৃতির নিত্য পরিহাস
অহংভবি দিবসের হত্যাকারী রজনীর প্রথম নিঃশ্বাস,
ভাবি, কবে, কোন্ নিশি-শেষে
প্রভাতের মুক্তি মাগি' অনন্ত মরণ এসে মেবে না কি হানা ?
নীল আকাশের চালে রাকা শশী স্বপ্ন-মাখা আলো
যবে করে শেষ—ঝিকিমিকি তারারা নিঃশেষ,
সেথা এসে নিদ্রালসা উষা কহিবে না :
'আলো দীপ আলো' ?
প্রজ্বলিত অগ্নিময় ভাস্কর-কিরণ
আনিবে না নিদ্রা তার করিতে হরণ ?
কোথা সেই ক্ষণ
তপন তেয়াগি যবে রক্তাম্বর—
মোর মুখে রবে চেয়ে বিপুল বিস্ময়ে
নিশান্তের শুকতারা সম।

মুক্তি-অভিলাষী আমি তাবি তাই
মুক্তি-পথ অনুসরি' যাপিতেছি জীবনের দীর্ঘ দিনমান।
কিন্তু হায়, মুক্তিরে কি পেতে পারি হৃদয়ে আমার
মৃত্যু যেথা যাত্রার অলঙ্ঘ্য অন্তরায়?
মৃত্যুর সোপানে যেয়া মুক্তির মন্দির।
সে তো মৃত্যু জরা-মুক্ত মাতার জঠরে,
সে তো মৃত্যু সদ্যমুক্ত শিশুর অন্তরে।
স্তব্ধ করি' কৈশোরের স্বপ্নসুখ
যৌবনের সূর্য্য যবে ওঠে জ্বলি' প্রদীপ্ত শিখায়,
কবি কাঁদে কবিতার কল্পনালতায়
ম্লান গোধূলি বেলায়।
শ্রাবণের বারিভরা উতলা প্রহরে
প্রিয়ারে বাহুতে বাঁধে যবে
সেখানে কি:মুক্তি তার?
সুকোমল শুভ্র তনু—তার প্রতি রোমকূপ হ'তে
সন্তর্পণে সর্পিল সাপনি বাহিরিয়া
বাঁধে তারে মরণের বাসপাশে।

যৌবনেরে ম্লান করি' মৃত্যু ব'য়ে আনে
মুক্তি-কামী বার্দ্ধক্যেরে।

যুগ যুগ ধরি' তারা মুক্তি মাগে
ভয়মুক্তি, লোভমুক্তি, মোহমুক্তি,
মুক্তি নাকি স্বপ্নহীন ঘুম
নাকি ইন্দ্রিয়নিরোধ।
জীবনের সায়াহ্ন লগনে
শুরু ঘরে মনের মন্দিরে জ্বালে দীপ,
শুশ্রূষা-সৌরভে ভরে গৃহ-কোন
মন্ত্রশিরে দেয় সন্ধ্যারতি
মুক্তির প্রতীক্ষা করি'—
তবুও কি মুক্তি দেয় ধরা?
সন্তানের সন্তাপেরে সুন্দর সে আনে কি স্বেচ্ছায়
প্রিয়া সম পূর্ণ কামনায়
মরণে হরণ ক'রে বিরহের দিনগুলি সম?
জীবনেরে রিক্ত করি' হানে তীব্র যেই পরাজয়
মরণের ছদ্মবেশ ধরি'
তারে তুমি মুক্তি বল, বল প্রিয়তম?

ওরে মূঢ়, পুরোতন জীর্ণ মরণেরে
বার বার করেছ কামনা ভিন্ন রূপে, ভিন্ন নামে;
তবু তাজিল না ভুল,
মুক্তিরে চাহিয়া তুমি চলিয়াছ নিরন্তর মৃত্যু-অভিসারে।

কল্পনা

কাত্যায়নীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কল্পনায় রূপসী আগুন।
কল্পনায় অর্থহীন উল্লাস।
তোমার এক মুঠো চুল আমার হাতে,
চোখে তোমার শুকতারার দীপ্তি।

চুম্বনের ভাষা আজ মৃত
আজকের স্পর্শে অসহ্য উচ্ছ্বাস নেই।
শুধু মনে আমার আগুন,
শুধু দেহে আমার অর্থহীন উল্লাস।

রাঙা সন্ধ্যা

অজিত দত্ত

রাঙা সন্ধ্যার শুভ্র আকাশ কাঁপায়ে পাখার বায়
তানা মেলে ঘুরে উড়ে' চ'লে যায় দু'টি কম্পিত কথা,
রাঙা সন্ধ্যার বহ্নির পানে দু'টি কথা উড়ে' যায় !

পাখার শব্দে কাঁপে হৃদয়ের প্রস্তর-স্তব্ধতা,
ঘুম হ'তে ঘুম তবু কানে বাজে সে-পাখার স্পন্দন,
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ, স্বপ্নের মতন তবু তা'র মর্মতা।

চ'লে যায় তারা চোখের আড়ালে—লক্ষ কথার ঘন
অট্টহাস্যে কোলাহল করে, তবুও তবুও কানে
কিসের আওয়াজ ? বক্ষ ছাপায়ে এ কি অনি-গুঞ্জন ?

যাযাবর যত পক্ষী-মিথুন—থামে তারা কোন্‌খানে ?
মানুষের ছায়া সে-আলোর নিচে পড়েছে কি কোনোদিন ?
তুমি তো আমারে ভুলে যাবে নাকো—যদি যাই সন্ধানে ?

তুমি নীড়, তুমি ঊষ্ণ কোমল ; পাখার শব্দ ক্ষীণ,
তবু সে আমারে ডাকে, ডাকে শুধু ক্লেদহীন, ক্ষমাহীন।

বসন্তের গান

সমর সেন

বসন্ত-পীড়িত বন থেকে আজ
মদির গন্ধ আসে,
শুধু মনে পড়ে
নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরে
সুদূর আকাশে চিলের ডাক।

নাহি জানে কেউ
রক্তে মোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ।
মালতী রাতের নরম উষ্ণ শরীর
রাত্রের ঘুমে আর দিনের চিন্তায়
সমুদ্রের জোয়ার এনেছে রক্তে।
দিকে দিকে আজ হানা দিল
নিষ্ঠুর বসন্ত।

তবু বসন্তের রাত্রে
স্বপ্নে দেখি ধূসর পাহাড়,
অন্ধকারে শুনি কিসের বিহ্বল পদক্ষেপ,
আর কর্কশ হাসির স্রোত
অকারণে অন্তরে কাঁপে ;
শিশিরে আর হাওয়ার বিষণ্ণ সঙ্কেতে
আবার রক্তে আসে সমুদ্রের গান,
তবু বসন্তের রাত্রে
স্বপ্নে দেখি ধূসর পাহাড়

বিলাসের দিন শেষ, দুরন্ত বনের বাঘ

প্রকৃতির কবি

বিদ্যালয়ে ইংরিজি কাব্যের পাঠ নিতে গিয়ে যখন শোনা যায় যে ওয়ার্ডস্বার্থ প্রকৃতির কবি তখন সহজবুদ্ধিতে সংশয় লাগে। প্রকৃতির কবি কোন্ কবি নন্? প্রকৃতির অফুরন্ত লীলাবৈচিত্র্য অন্তত কখনো-কখনো ভালো না লাগে এমন নিরেট সাধারণ লোকের মধ্যেও যখন দেখা যায় না, তখন কবিনামের যোগ্য যে-কোনো ব্যক্তির সুস্থ হৃদয়বৃত্তিকে অতি তীব্রভাবেই তা নাড়া দেবে এ তো জানা কথা। শেক্‌স্‌পিয়র কি প্রকৃতির কবিও নন? শেলি? কীট্‌স্? যদি বলা হয় যে ওয়ার্ডস্বার্থ জড়প্রকৃতির মধ্যে এক জীবন্ত ও সর্বব্যাপক সত্তা খুঁজে পেয়েছিলেন—সত্যি বলতে, সকল কবির কাছেই প্রকৃতি জীবন্ত, এবং এ-উপলব্ধি শেলির মতো তীব্র অন্য কোন্ কবিতে তা জানিনে। যদি বলা হয় ওয়ার্ডস্বার্থের প্রকৃতিপ্রেম ছিল তাঁর পক্ষে ধর্মের সামিল সে-কথা মানবো; কিন্তু সেই ধর্মের সারতত্ত্ব অ্যাল্ডাস হাক্সলি যাকে 'দ্য পেরেনিয়াল ফিলসফি' বলেছেন তার নির্যাসিত ডিটেল খুব সংক্ষেপেই কি বলেননি—হয়তো কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের সুরে—যখন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন 'books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything'? এর চেয়ে বেশি ওয়ার্ডস্বার্থ কী বলেছেন?

তবে এটা সত্য যে প্রকৃতি ছাড়া অন্য-কোনো বিষয়ে ওয়ার্ডস্বার্থ কবিতা লেখেননি, লিখলেও সফল হননি। সেইজন্যে ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রকৃতির কবি। লেখেন-আঁটা। কবিদের গায়ে লেখেন আঁটা থাকলে ক্রটিরেট ডিগ্রিকামীদের সহায়তা হয়, কিন্তু রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। প্রকৃতিবিষয়ক কবিতায় সমস্তটা ক্ষেত্র যেন ওয়ার্ডস্বার্থেরই দখলে। প্রকৃতি সম্বন্ধে নতুনরকমের অনুভূতি ও আবেগ পরবর্তীযুগের যে-সব কবিতে পাওয়া যায়—যেমন কেট্‌স, এড্‌ওয়ার্ড টমাস—তাঁদের কাব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগী কি শ্রদ্ধাবান হ'তে যদি আমরা ভুলে যাই, সেজন্য

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ই দায়ী। প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্বার্থের মনোভঙ্গি তো একমাত্র নয়, এবং তিন্ন মনোভঙ্গি আমাদের অনেকের পক্ষেই হয়তো বেশি উপভোগ্য হ'তে পারে।

আমাদের কবিদের মধ্যে অবশ্য রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতির কবি হিসেবে প্রধান। এ-কথা বললেও ভুল হয় না যে তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়ই প্রকৃতি। যত কবিতা ও গান তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে বেশির ভাগই তো সোজাসুজি প্রকৃতিসম্পর্কিত। তা ছাড়া, তাঁর 'জীবন-দেবতা'র উপলব্ধিও মূলত প্রকৃতির ভিতর দিয়ে; গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য প্রভৃতি 'আধ্যাত্মিক' গ্রন্থও এ-বিষয়ে নিঃসংশয় সাক্ষ্য দেবে।

অবশ্য একহিসেবে সকল কবিই প্রকৃতির কবি, এ-কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু সকল কবিকেই ঐ আখ্যা দেওয়া যায় না; কারণ সকলের পক্ষেই প্রকৃতি একমাত্র কি প্রধান বিষয় নয়। অনেক কবির পক্ষে প্রকৃতি মানবজীবনের নানা অভিজ্ঞতার পটভূমিকা; অনেকের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিলাস, অনেকের পক্ষে প্রেমের উদ্দীপনা ও প্রতিচ্ছবিমাত্র। প্রকৃতিকে অতি নিবিড়ভাবে অনুভব না করেন এমন কোনো কবি নেই; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি।

আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায় তিনি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর নব-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ধূসর পাণ্ডুলিপি প'ড়ে এই কথাই আমার মনে হ'লো। অবশ্য এই বইয়ের কবিতাগুলো আমার পক্ষে একেবারে নতুন নয়। এদের রচনার কাল আজ থেকে এগারো বছর ও সাত বছরের মধ্যে; এবং সেই সময়ে এরা যখন অধুনালুপ্ত কয়েকটি মাসিকপত্রে আত্মপ্রকাশ করে, তখন থেকেই এদের সঙ্গে আমার পরিচয়। জীবনানন্দর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালক ১৩৩৪ সালে বেরিয়েছিলো, এবং তার রচনাকাল আরো কিছু আগে হবে নিশ্চয়ই। সে-বইখানা তখনো কারো বিশেষ নজরে পড়েনি, এখন তো একেবারেই বিস্মৃত। মোহিতলালের কলম-পসারীর মতো, ঝরা পালকেও নতুনের প্রস্তাব

ছিলো স্পষ্ট। যে-মৌতাতের ঝোঁকে মোহিতলাল এই লাইন লিখতে পেরেছিলেন—

উটপাখী তার ডিমগুলো কি লুকিয়েছে ঐ বুকে

সেটা জীবনানন্দও এড়াতে পারেননি তখন। তবু তাঁর কবিতায় স্বতন্ত্র বিশেষ-কিছু হয়তো ছিলো না, কিন্তু তাঁর কয়েকটি লাইন দেখছি আজো ভুলতে পারিনি :

তাকিয়া করিল মোরে হাতায় দুলাল—
ডালিমফুলের মত ঠোঁট যার, পাকা আপেলের মত লাল যার গাল,
চুল যার রাতের মেঘ, আর আঁখি যার পোড়ুলির মত সোনালি রঙিন,
তারে আমি দেখিয়াছি প্রতি রাতে—স্বপ্নে—কতদিন।

সত্যেন দত্তীয় ভঙ্গির থেকে এ অনেক দূরে; অতি পুরোনো কল্পনা যেন একটি নতুন ও অপূর্ব রূপ পেয়েছে এখানে। তার কারণ ছন্দের নবত্ব, শব্দের বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি লাইনে সম্পূর্ণ একটি ছবি পেলুম; এ-ছবির রচনায় যে কলাকৌশল দেখেছি, তা এই কবিতাই নিজস্ব সৃষ্টি। বস্তুত, এখানে জীবনানন্দর নিজস্ব সৃষ্টিপ্রেরণারই পরিচয় পাওয়া যায়; পড়তে-পড়তে মনে হয় একজন নতুন কবির মুখ দেখা গেলুম।

এই সৃষ্টিপ্রেরণা অবশ্য চাপা থাকলো না; অল্প সময়ের মধ্যে দেখা গেলো তার প্রগতি ও পরিণতি। যে সময়ে জীবনানন্দ যে-সব কবিতা বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন তা প'ড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম; এবং এখন সেগুলোই দেখতে পাচ্ছি ধূসর পাণ্ডুলিপিতে একত্রিত। ভালো কবিতার কেমন একটা আদিম অপূর্বতা আছে: মনে হয় এ যেন সদ্যোজাত অথচ চিরন্তন। এইমাত্র এই মুহূর্তে এর জন্ম হ'লো, এবং চিরকালের মধ্যে এর মতো আর কিছু হবে না। এই কবিতাগুলোর ছিলো সেই সুরের অনন্যতা ও অখণ্ডতা, প্রতিটি রচনার ভিতর দিয়ে এমন একটা সুর বুকে এসে লাগলো, যেরকম আর কখনো শুনিনি। একেবারে নতুন সেই সুর, আর এমন অদ্ভুত যে চমকে উঠতে হয়।

বহুর দশেক পরে সেই কবিতাগুলোই আবার প'ড়ে সেইরকমই ভালো লাগলো। ইতিমধ্যে জীবনানন্দর কাব্যপ্রেরণা ঝিমিয়ে পড়েনি, তার প্রমাণ

তিনি সম্প্রতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় দিয়েছেন। সত্যি বলতে, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সব চেয়ে সক্রিয়। তাঁর কল্পনা সবসময়ই নব-নব রূপের সন্ধানী, তাঁর রচনাভঙ্গি গভীরতর পরিণতির দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু এতদিনেও আমাদের সাহিত্যের বাজারে তাঁর খ্যাতির রোল ওঠেনি। আমাদের সুধীশ্রেণীও তাঁর কাব্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত, এমন মনে হয় না। আধুনিক বাঙলা কাব্য সম্বন্ধে কোনো আলোচনাতেই জীবনানন্দর উপযুক্ত উল্লেখ এ-পর্যন্ত দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। জীবনানন্দর ব্যক্তিত্ব লোকচক্ষু থেকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন, এ ছাড়া এই অজ্ঞাতের আর-কোনো কারণ আছে কিনা জানিনে। কবিতা ছাড়া আর-কিছু তিনি লেখেন না, কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীভুক্ত হ'য়ে দেশে-বিদেশে আত্মপ্রচারের আয়োজন তিনি কখনোই করেননি। আমার বিশ্বাস, এ-পর্যন্ত দু'জন চারজনের বেশি অনুরাগী পাঠক তাঁর জোটেনি। তবে এটাও লক্ষ্য করবার যে অতি-আধুনিক বাঙলা কাব্যে তাঁর প্রভাব বেশ স্পষ্ট।

২

আমাদের বাঙলাদেশের পাঠকসাধারণের মধ্যে জীবনানন্দ যদি অজ্ঞাতই থাকেন সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, তবে গুটি কয়েক, কাব্যসম্ভোগের প্রকৃত অধিকারী যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ধূসর পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পর তিনি স্বীকৃত ও সম্মানিত হবেন এ-আশা জোর ক'রেই করা যায়। ধূসর পাণ্ডুলিপি প'ড়ে এ-কথাই প্রথমে মনে হয় যে এই লেখকের আছে সত্যিকারের স্টাইল। কোথাও-কোথাও সেটা হয়তো মুদ্রাদোষে অবনত হয়েছে (যদিও সেটা খুব কম), এবং তা নিয়ে ঠাট্টা করাও খুব সোজা। কিন্তু যদি আমরা সত্যি কবিত্বশক্তিকে শ্রদ্ধা করি, যদি কবিতা আমাদের পক্ষে ইয়ারকির বিষয় না-হ'য়ে গভীর অনুশীলনের বিষয় হয়, তবে এ-কথা আমাদের মানতেই হবে যে এই কবি এমন একটি সুরের সম্মোহন সৃষ্টি করেছেন যা ভোলা যায় না, যা ভুল হয় না, যা হানা দেয়।

জীবনানন্দ প্রকৃত কবি ও প্রকৃতির কবি। ঠিক প্রেমের কবিতা বলতে যা বোঝায় ধূসর পাণ্ডুলিপিতে তা একটিও নেই। 'নির্জন স্বাক্ষর' '১৩৩৩'

'সহজ' 'কয়েকটি লাইন' এ-সমস্ত কবিতায় প্রেমের পাত্রী অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিই অনেক বড়ো ও জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে কবির কল্পনায়। এটা উল্লেখযোগ্য যে জীবনানন্দ একেবারেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরিজি কাব্যস্রোতে প্রচুর স্নান করেছেন তিনি: 'জীবন' 'প্রেম' এই দীর্ঘ কবিতাদুটিতে শেলি কীট্‌স্ উভয়েরই প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, শেলির চাইতে বরঞ্চ কীট্‌সের প্রভাব বেশি, কীটসের চাইতে বরঞ্চ ওইনবর্ন ও প্রিরাফেলাইটদের। এবং সব চেয়ে বড়ো কথা যেটা, সমস্ত প্রভাব ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি ও সৃজনীশক্তি। যে-দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অপরূপ হ'য়ে ওঠে, ভূস্তরকে ঘিরে গ'ড়ে ওঠে বহির্মণ্ডল, সেই দৃষ্টি জীবনানন্দের। অতি ছোট-ছোট জিনিস নিয়ে অতি সূক্ষ্ম সঙ্গীতের জাল তিনি এমনভাবে বুনে গেছেন যে বিশ্লেষণ ধরা দিতে চায় না।

যদি আমি এই হৃদয়েরে
সে কেন হৃদের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!

ছন্দের বাঁকাচোরা গতিতে, সূক্ষ্ম ধ্বনিতে ও বিকৃতিতে, পুনরুক্তিতে ও ও প্রতিধ্বনিতে মনে হয় যেন এই কবিতাগুলো আঁকাবাঁকা হৃদের মতই ঘুরে ঘুরে একা কথা বলছে। এদের আবহতে আছে একটি সুদূরতা ও নির্জনতা; আমাদের পরিচিত পরিবেষ ছাড়িয়ে, এই আকাশ আর পৃথিবী ছাড়িয়ে, অন্য কোনো আকাশে অন্য কোনো জগতে এক সম্পূর্ণ রূপকথার রচনা। জীবন ক্ষণীল ও পরিবর্তনশীল, মৃত্যুতে সব জিনিসেরই সমাপ্তি, এই আদিম বেদনা জীবনানন্দর কাব্যের ভিত্তি।

পৃথিবীর সাধ—এই দেহের বাসাতে
হৃদয়ে বেদনা হবে :—অসীমের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই! ···
পৃথিবীর দিন আর রাতের আঘাতে
বেদনা শেষ না হবে কেউ আর,—
থাকিবে না হৃদয়ের ভরা,—
সবাই হৃদয়ে হাতে দিবে যদি ধরা! ···

ইয়েট্‌স্‌-এর লাইন মনে পড়বে অনেকেরই ; এ-কথা অনেক কবিরই মনের কথা সন্দেহ নেই। স্বপ্নের হাতে ধরা দিতে চান যে-সব কবি তাঁদের প্রত্যেকেরই 'স্বপ্ন' বিশেষ একটি রূপকথার মূর্তিগ্রহণ করে। প্রকৃতির নির্জন ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে জীবনানন্দ তাঁর রূপকথা সৃষ্টি করেছেন।

তার পর,—একদিন
আবার হলদে ঘুণ
ভ'রে আছে মাঠে,—
পাতার, শুকনো ডাঁটে
ভাসিয়ে কুয়াশা
দিকে দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে,—পথের উপর
পাখীর ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড়কড়!
শালুক,—দু' একটা নষ্ট পাতা খসা,—
মাকড়ের ছেঁড়া জাল,—শুকনো মাকড়সা
লম্বায় পাতায় ;—
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায় ;
দেখা যায় অনেকটা তারা
চির আকাশের গায়,—ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে মাঠে, ক্ষুধা থেকে প্রেম পিপাসা আলো মেটে,
পড়িশ বছর তবু দেহে তবে কেটে।

('মাঠের গল্প')

আকাশের মেঠো পথে খেয়ে ভেসে চলে চাঁদ :
অবসর আছে তার,—অবেলার খড়ের আঠার
আমাদের শেষ হয়ে যখন সে চ'লে যাবে পশ্চিমের পারে,—
এটুকু সময় তাই কেটে যাক্‌ রূপ আর কামনার ধারে।

* * *

এখানে সাহিত্য কাজ,—উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের সাহিত্য ভাবনা ;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।

অলস মাছির পাখে ক'রে ধরেছে সকালের বিষণ্ণ সময়,
পৃথিবীরে আরো ধীর জলীয় পাখের কেশ ব'লে মনে হয়!
সকল পতঙ্গ মৌন চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিয়েছে এইখানে এসে
শীতের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন ভেবে ভেবে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।

('অবসরের গান')

কহিল সে,—উত্তর সাগরে
আর নাই কেউ!—
জ্যোৎস্না আর সাগরের ঢেউ
উঁচুনীচু পাথরের 'পরে
হাতে হাত ধ'রে
সেইখানে; কখন ফেরেছে তারা—তারপর ঘুমাল কখন্!
কেমনে যখন তারা হাঁটু—পালে,—
আর তারো ঢেউয়ের মতন
জড়ায়ে জড়ায়ে যায় সাগরের জলে!
ঢেউয়ের মতন তারা চলে!
সেই জল-মেয়েদের স্তন
হাঁটু,—সাদা,—বরফের কুঁচির মতন!
তাহাদের চোখ দুই ঝিনে,—
কেমনে সেনিজে
তাহাদের শরীর পিছল!
কাদের শুক্তির মত শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে!

('পঙ্ক্তিপর')

এই সমস্ত রচনায় আছো আলোর লীলা, আছো ঘুমের ঘোর; এই আবছায়ায়, এই অলসতায় কবির মুক্তি।

জীবনানন্দর কাব্যে দেখা যায় রূপক রচনায় অক্লান্ততা, সেই রূপকের বিশেষত্বও উল্লেখযোগ্য। যত উপমায় যত ইঙ্গিতে তিনি কল্পনাকে প্রকাশ

করেন সেগুলো ভাবাত্মক নয়, রূপাত্মক, চিন্তাপ্রসূত নয়, অনুভূতিপ্রসূত। আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সব চেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক,' সব চেয়ে বেশি 'শারীরিক'; তাঁর রচনা সব চেয়ে কম বুদ্ধিগত, সব চেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়গত। তাঁর এই বিশেষত্বই কীট্‌স্ ও প্রিরাফেলাইটদের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর একটি কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন 'চিত্রকল্পময়'। জীবনানন্দর সমগ্র কাব্য সম্বন্ধেই এই আখ্যা প্রযুজ্য। কথা দিয়ে ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ। তার উপর, ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে। গন্ধ ও স্পর্শ দিয়ে অনেক অপরূপ অভিজ্ঞতা আমরা সংগ্রহ করি; কিন্তু এই দুই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি জীবনানন্দর মত এত পূর্ণমাত্রায় আমাদের আর কোন্ কবি ব্যবহার করেছেন জানি না। তাঁর যে-কবিতাটি প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ মন্তব্য করেছিলেন, তা থেকে কয়েকটি ছবি উদ্ধার করছি :

দেখেছি নদুর পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে ঝরেছে চমৎ.
চিমনের জানালায় আলো আর ধূলিমূলি করিয়াছে খেলা.
ইদুর খাতের যাতে রেশমের মত কোনে মাখিয়াছে ধূল.
চালের ধূসর গন্ধে ভরেছে কপ চ'রে অঘ্রাণ ও'বেলা
নির্জন মাঠের চোখে :—পুকুরের পাশে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের স্বাদ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;

দিনান্তের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে.
বেতের লতায় নিত্য চড়ুয়ের ভিম যেন শক্ত হ'য়ে আছে.
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী যায় যায় তীরটিরে মাখে.
খড়ের চালের ছায়া পাড় ঘাসে জ্যোৎস্নায় উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সমুদ্র বাতাসে ;
নীলাভ মোনায় ঘুমে ঘন ঘন গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে :

('মৃত্যুর আগে')

এই ছবিগুলি সম্পূর্ণই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; স্পর্শ আর গন্ধ তো আছেই, রসনার স্বাদও একেবারে বাদ পড়েনি। এ তো সত্যি কথা যে আমাদের

সমস্ত অনুভূতিই শরীরের মারফৎ এসে পৌঁছয়; অথচ কবিতায় এই অনুভূতিগুলোর অবিমিশ্র প্রকাশ অনেকেই করেন না কি করতে পারেন না, উপরন্তু যদি কেউ করেন তাঁর কপালে অস্ত্র নিন্দাই জোটে। কীট্‌স্ যে 'sensuous' মাত্র, 'sensual' নন, সেটা প্রমাণ করতে অধ্যাপকরা গলদ্‌ঘর্ম: এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার জন্যেই রসেটি সুইনবর্নের লাইনগুলি। আমাদের কবিদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সম্বন্ধে এই সূক্ষ্ম চেতনা জীবনানন্দর মতো আর কারুরই নেই; তাঁর রচনায় তত্ত্ব নেই, চিন্তাশীলতা নেই, কোনো কৃত্রিমতা কি অনুকরণ নেই; তা স্বতঃস্ফূর্ত, বিশুদ্ধ ও সহজ, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত অভিজ্ঞতায় সৃষ্টি, তা নিছক কবিতা, কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩

পরিশেষে আদিকের দিক থেকে দু' একটি কথা বলতে ইচ্ছা করি। জীবনানন্দর কান নিখুঁত। ছন্দকে ইচ্ছামত বেঁকিয়ে-চুরিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি নিয়ে গেছেন, যেখানে আটকেছে সেখানে আটকানোটাই কবির উদ্দেশ্য ছিলো। একই ছন্দের ছাঁচ বিভিন্ন কবির হাতে বিভিন্ন সুরে বাজে এটা পুরোনো কথা; ধূসর পাণ্ডুলিপি তার চমৎকার দৃষ্টান্ত। এ-বইয়ের সবগুলো কবিতাই পয়ারজাতীয় ছন্দে; বেশির ভাগ অসমমাত্রার, যাকে বলতেই হয় বলাকার ছন্দ। অর্থাৎ চেহারাটা বলাকার ছন্দের, কিন্তু ধ্বনি একেবারেই ভিন্ন। বলাকার তীব্রতা ও বেগ নেই এখানে; এ-ছন্দে মন্থর, যেন ইচ্ছে ক'রে ভাঙা-ভাঙা, অসমান ও পালিশ-না-করা, এ-ছন্দ থেমে-থেমে ঘুরে-ঘুরে চলে, ঘুমে ভরা মধুর এর সুর, স্বপ্নে-ভরা, শিশির-কোমল, যেন ঘুমের মধ্যে গান এসে কানে লাগে, তারপর সমস্ত রাত ছানা যায়। কলাকৌশলের অভাব নেই এই কবিতাগুলিতে, সেগুলোর প্রধান গুণ এই যে তারা প্রচ্ছন্ন। মিলে, অন্তর্মীন মিলে, অনুপ্রাসে, পুনরুক্তিতে ধ্বনির সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য প্রতি পংক্তিতে খেলে উঠছে; সে যেন অনাবিল ও প্রশান্তক, স্বপ্নের সুরভি অলস ভাবনার যাওয়া-আসা।

বোম্বাইয়ের সমুদ্রের জাহাজ যখন
মধ্যরাত্রির অন্ধকারে ঢিল করে, দেখে তাই ;—একবার ঘিরে মালাবারে
উড়ে যায় ; কোন্ এক নিনারের বিষণ্ণ কিনার ঘিরে অনেক পাখুল
পৃথিবীর পাখীদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর ওপারে।

('পাখুল')

ধ্বনির দিক থেকে এর চেয়ে ভালো রচনা বুদ্ধদেব পাণ্ডুলিপিতে নেই। এই ধ্বনি উচ্চ নয় তীব্র নয়, কিন্তু গভীর ও প্রতিধ্বনিময়। নামশব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে এতখানি কৃতিত্ব আর কোনো আধুনিক কবির দেখিনি। জীবনানন্দ নামশব্দ ব্যবহার করেন মিলটনের মত জমকালো ধ্বনি সৃষ্টি করতে নয়, প্রিরাফেলাইটদের মত ছবি ফোটাতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উজ্জয়িনী মালবিকা প্রভৃতি পুরাণযুগের নাম যে-উদ্দেশ্য সাধন করে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যই জীবনানন্দ সাধিত করেছেন বোম্বাই মলঙ্গা লেন প্রভৃতি আধুনিক 'কবিত্ব'হীন নাম দিয়ে।

সাগরের জল পাখে—আরো দূর পাখে
কোনো এক নেকড়ার পাহাড়ে
এই সব পাখী ছিল ;
শিকারীর তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর,—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।
মাদাগি—সোমালি—পাদা—ফুটফুট ডানার ভিতরে
ধবধবে বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল,—
যেমন হয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল উ'রে সমুদ্রের বুকে
তেমন অতল সত্য হ'য়ে।

('পাখীরা')

ইংরিজি শব্দগুলোকে বাঙলার প্রাকৃত ছন্দের সঙ্গে এমনভাবে মেশানো হয়েছে যে আশ্চর্য্য বলতে হয়। একটু খোঁচ নেই। এটাও লক্ষ্য করবার যে জীবনানন্দর পয়ারে যুক্তাক্ষর কম। যুক্তাক্ষরের অভাবে পয়ারের শিথিল ও মেরুদণ্ডহীন হ'য়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে ; কিন্তু এই

কবি একটি লাইনও লেখেননি যাতে কচুতা, মূঢ়তা কি গাম্ভীর্যের অভাব। বরঞ্চ, মুক্তাকণের স্বচ্ছতাই কবি এমনভাবে ব্যবহার ক'রেছেন যাতে পরাবে লেগেছে নতুন সুর।

এই আলোচনা আমি দীর্ঘ করলুম কেননা জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি ব'লে বিবেচনা করি, এবং ধূসর পাণ্ডুলিপি তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ। আমার নিজের তাঁর কবিতা অত্যন্তই ভালো লাগে, কিন্তু আশা করি নেহাৎই আমরা ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা এই মতামত গঠিত হ'তে দিইনি। আমাদের দেশে কোনো ক্ষেত্রেই কোনোরকম স্ট্যাণ্ডার্ড নেই, সাহিত্যে একেবারেই নেই। প্রতিভা হয় অবজ্ঞাত, তৃতীয় শ্রেণীর কবি অভিনন্দিত হয় অ-সাহিত্যিক কারণে। আমাদের মূল্যজ্ঞানহীন সমাজের মূঢ়তাকে মাঝে-মাঝে নাড়া দেয়াই দরকার; নিজের বিশ্বাসটা মাঝে-মাঝে জোর ক'রেই বলা দরকার। এ-দেশে মাতৃভাষার সাহিত্যকে যাঁরা শ্রদ্ধা ক'রে ভালোবাসেন (যদি আজকালকার দিনে এমন কেউ থাকেন) তাঁরা ধূসর পাণ্ডুলিপি নিজের পয়সেই পড়বেন, কারণ এ-বইয়ের পাতা খুললে তাঁরা একজনের পরিচয় পাবেন যিনি প্রকৃতই কবি, এবং প্রকৃত অর্থে নতুন। বিশেষ ক'রে, 'শকুন,' 'পাখীরা', 'অবসরের গান', 'মৃত্যুর আগে', 'ক্যাম্পে' এ-সব কবিতা প'ড়ে তাঁরা স্বতঃই উপলব্ধি করবেন যে বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব শক্তির আবির্ভাব হয়েছে।

নতুন কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, দুই টাকা।

কবিতার অনুবাদ সম্বন্ধে আমি একটি মত পোষণ ক'রে এসেছি। হয়তো সেটা নেহাৎই ব্যক্তিগত, তবু এখানে বলি। অতি বিখ্যাত কি কি অতি মহৎ কাব্যের অনুবাদ চেষ্টা করাই উচিত নয়—আর যদি এ-দুঃসাহসী চেষ্টা না-করলেই নয় তবে ছন্দ-মিল বজায় রেখে নিকট অনুসরণ না-ক'রে মুক্তছন্দের গদ্যে করাই যুক্তিসঙ্গত। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত, অপেক্ষাকৃত মাঝারি কবিতাই তর্জমা করবার পক্ষে ভালো। যদি কেউ মনে করেন আমি নিজে কোনো মহৎ কবিতার অনুবাদে হাত দিইনি কি হাত দিয়েও সফল হইনি, আমার এ-মতের এ ছাড়া আর কোনো ভিত্তি নেই, তাহ'লে দু' একটা দৃষ্টান্ত দিই। শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর ছাত্রাবস্থায় কীট্‌সের ওড টু নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি কয়েকটি সনেটের রূপের আধারান্তর সাধন করেছিলেন। তাঁর অনুবাদ ব্যর্থ হয়েছিলো বললে তাঁর উপর দোষারোপ করা হয় না। ঐ কবিতা এবং ঐরকম কবিতার অনুবাদ ব্যর্থ হ'তেই বাধ্য এ-কথাই আমার মনে হয়েছিলো তখন। পরিচয়ের পৃষ্ঠায় শেলির 'One word is too often profaned' কবিতার বিভিন্ন অনুবাদ প'ড়ে আমার এ-মত আরো দৃঢ়ই হয়েছিলো। যতদূর মনে করতে পারি, ঐ পত্রিকাতেই শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যালের শেলির রাত্রি কবিতার অনুবাদ এর একমাত্র ব্যতিক্রম। কদাচিৎকে ও-রকম তর্জমা হয়।

সত্যেন দত্তর কথা ভাবুন। কবিতার অনুবাদে এমন পরিষ্কার হাত আর-কেউ দেখাননি; কিন্তু তাঁর কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত কীট্‌স্-এর না নেল্ বাদ্ নয়, নোঙটির ওহাক কবিতা। নানা ভাষা থেকে যত ছোট-ছোট উজ্জ্বল রচনা তিনি মাতৃভাষায় আহরণ করেছিলেন তার কোনোটিই

কাব্যপর্যায়ে শ্রেষ্ঠতার দাবি রাখে না ; সেগুলো ভালো কবিতা, কিন্তু মহৎ কবিতা নয়, এবং অনুবাদকের কৃতিত্বের সেটাও একটা কারণ। সত্যেন্দ্রনাথ ওল্ড টু ওল্ডেস্ট উইও তর্জমা করতে যাননি, এ-জন্য তাঁর প্রশংসাই করবো। মহৎ কাব্যের অনুবাদ প্রায় অসম্ভব।

তবে একেবারেই যে অসম্ভব তাও বা বলি কেমন ক'রে ? যা এ-পর্যন্ত হয়নি সেটা কখনোই হবে না এটাও অন্ধ ধারণা বইকি। প্রতিভা থাকলে কী না হয় ? সফোক্লিসের ইডিপস ইয়েটস তো ইংরিজি পদ্যে লিখেছেন। আমি এক বর্ণও গ্রীক জানিনে। তবু সাহস ক'রে বলবো যে ইয়েটস-এর অনুলিখন যত ভালো, সফোক্লিসের রচনা যদি ঠিক ততটাই ভালো হয়, তাহ'লেও তাঁর বিরাট খ্যাতি সার্থক। ফিটজেরাল্ড ইত্যাদি মামুলি উদাহরণ তো আছেই। ক্ষমতা থাকলে বাঙলায় সেক্সপিয়র কি ব্রাউনিঙই বা অসম্ভব হবে কেন ?

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ব্রাউনিঙের একটি দুটি নয়, পঞ্চাশটি কবিতা তর্জমা করেছেন এ-কথা শুনতেই অবাক লাগে। এই লেখকের পরিচয় তাঁর নামে নয়, তাঁর রচনায়। আপনি হয়তো মৈত্র মহাশয়ের বহু কবিতা প'ড়েও আজো তাঁর নাম জানেন না। বিভিন্ন ও বহু ছদ্মনামে বিভিন্ন ও বহু সাময়িক পত্রে গদ্যে ও পদ্যে অনেক কবিতা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর প্রধান গুণ এই যে তিনি তাড়াহুড়ো দেখেন, অজস্রও দেখেন ; তাঁর কল্পনার কৃপণতা কি কলমের ক্লান্তি নেই। কবিতার অনুবাদেও তাঁর প্রচুর উৎসাহ, এবং একমাত্র অনুবাদ-রচনাতেই তিনি স্বনাম স্বাক্ষর করেন। অনুবাদ-শিল্পী হিসেবে এই বইখানি তাঁর প্রামাণ্য সৃষ্টি।

প্রথমেই তাঁর সাহসকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। সকল ইংরেজ কবির মধ্যে ব্রাউনিঙের যে তর্জমা হ'তে পারে এ-কথা ভাবতে আমার তো কখনো সাহস হয়নি কি হ'তো না। কেননা ব্রাউনিঙ শুধু যে মহৎ কবি তা নয়, তাঁর রচনা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। যে-সব কবির ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রখর, তাঁরা অনুবাদে কিছুতেই ধরা দিতে চান না, এবং ব্রাউনিঙের সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মহিমায় ও মুদ্রাদোষে, প্রতিটি কথায় ও

কথা-চুটকিতে। ব্রাউনিঙ পড়াটাই তো এক-এক সময় মানসিক মল্লযুদ্ধ, তাঁর অনুবাদ না জানি আরো কতগুণে মল্লযুদ্ধ!

কিন্তু মৈত্র মহাশয়ের এই বইখানাতে মল্লযুদ্ধের চিহ্নমাত্র নেই। এত সহজে তিনি অনুবাদ ক'রে গেছেন যে দেখে অবাক লাগে। অবশ্য তার ফলে কবিতাগুলোও অত্যন্ত সহজ হ'য়ে গেছে। এমনকি, অনেক ক্ষেত্রে না-ব'লে দিলে ব্রাউনিঙ ব'লে বুঝতেই পারতুম না। ব্রাউনিঙকে অত্যন্ত তরল ক'রে নিয়ে তরল বাঙলা গদ্যে অনায়াসে তিনি লিখে গেছেন। তারই মধ্যে চেষ্টা করেছেন মূল কবির ছন্দ মিল মোটামুটি অনুসরণ করতে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রাউনিঙের রীতিবৈশিষ্ট্য কিছু কোটেনি; অন্যদিকে, অনুবাদকের স্বাধীন কবিমনস্তি পদে-পদে মূলকে অনুসরণ করতে গিয়ে চাপা পড়েছে। মৈত্র মহাশয়েরই লেখা ভালো কবিতা পড়তে গেলে আমরা খুশি হতুম, কি গদ্যছন্দের রচনায় ব্রাউনিঙের ভাববস্তু আরো বেশিমাত্রায় পাওয়া গেলেও ভালো ছিলো। ব্রাউনিঙের রচনারীতি ছিলো অদ্ভুত, আশ্চর্য, কখনো-কখনো উৎকট; সেটা নিরস্ত ক'রে নেয়া যদি অসম্ভব, তবে নিজেরই ধরণে ভালো কবিতা তৈরি করলে ব্রাউনিঙ কি অনুবাদক কারুরই ক্ষতি হ'তো না। মনে করুন 'ঘরে-বাইরে'তে 'ক্রিস্টিনা'র প্রথম দু'লাইনের তর্জমা:

> আমায় ভালোবাসবে না সে এই যদি তার ছিল জানা।
> তবে কি তার উচিত ছিল আমার পানে মরম হানা?

এ তো একেবারেই রবিঠাকুর, কিন্তু ভিতরের উপাদানটা ঠিকই ব্রাউনিঙের। এই পংক্তি দুটি মৈত্র মহাশয় করেছেন এই:

> উচিত ছিল না তার সে চাহনি হানা মোর 'পরে
> না ছিল বাসনা যদি প্রাণে তার মোর প্রেম তরে।

পাশাপাশি এই দুই পদ্য পড়লে আমার অর্থ স্পষ্ট হবে। তারপর মূল ব্রাউনিঙের সঙ্গে খানিকটা তুলনা ক'রে দেখা যাক। নিচের এই কবিতাটি আমাদের সকলেরই অল্পি পরিচিত:

Escape me ?
Never—
Beloved !
While I am I, and you are you.
So long as the world contains us both,
Me the loving and you the loth.

মৈত্র মহাশয়ের অনুবাদ :

আমারে এড়াবে তুমি ভেবেছ কি মনে ?
—কভু নয়, জেনো এ জীবনে।
যতদিন ভবে
আমি হ'ব আমি, আর তুমি তুমি হ'বে,
—আমার অনুসরণ, পলাইন তোমার সতত,
তুমি বিমুখিনী নারী, প্রেমাতুর আমি অবিরত।

ইভেলিন হোপ্-এর প্রথম দু' লাইন :

Beutiful Evelyn Hope is dead !
Sit and watch her side an hour.

অনুবাদে হয়েছে এই

সে যে হায় নাই আর ! সুকুমার ফুলের মতন
ছিল যার মুখখানি, ছিল সে কুমারী যতন
মরণ আপন হাতে। বসে আছি শবদেহ পাশে।

ব্রাউনিঙ যদি আজো বেঁচে থাকতেন এবং যদি তিনি বাঙলা পড়তে পারতেন তাহ'লে এই তর্জমা প'ড়ে তাঁর কী মনে হ'তো আমিনে। কাব্যের 'বিষয়' তো মোটামুটি সব কবিতেই এক, বলবার ভঙ্গিতেই বিশেষত্ব। ব্রাউনিঙ যদি বাঙালি হতেন তাহ'লে 'বিমুখিনী নারী' 'কুমারীরতন' গোছের মরচে-পড়া শব্দ কখনোই তাঁর কলমে আসতো না, 'সে যে হায় নাই আর !' ব'লে শোক-গাথার সূত্রপাতও তিনি করতেন না। ব্রাউনিঙের প্রধান বিশেষত্ব এইখানেই যে তাঁর কাব্যের ধরণ ছিলো ঠিক কথা বলার ধরণ ; একদিকে

তাঁর শব্দসম্পদ যেমন বিশাল ও অসাধারণ ছিলো তেমনি অতি গভীর অতি সূক্ষ্ম কবিতাও ছোট-ছোট জীবন্ত কথায় একেবারে চলতি ইংরিজিতে তিনি লিখেছেন। একজন আর-একজনের কাছে বলছে: তাঁর প্রায় সব কবিতার ধাঁচই এই। ঢংটা গীতিকবিতার নয়, নাটকীয় কবিতার। এই নাটকীয়তা মৈত্র মহাশয়ের অনুবাদে সঞ্চারিত হয়নি। পকিরিয়াজ লভার-এর কণ্ঠস্বর, অসহ্য ব্যাকুলতা চিমে তালের ছন্দে কাটা-কাটা ঝোঁকে "খিরি" প্রেমের কবিতায় পরিণত হয়েছে। যেবার দেশ আমি বরাবর অতি চমৎকার কবিতা ব'লে তর্জমা ক'রে এসেছি, এই বইয়ে তারও অনুবাদ দেখে রীতিমত অবাক হ'য়ে গেলুম। কিন্তু—

আজি সাগরের তীরে অতি ক্ষুদ্র এ কুটীরে
মোরা বাঁধে বসেছি কুলায়।
জানে চিহ্ন নিরবধি পশ্চিমের প্রভাতরবি,
অস্তিকূলে আতপ বিলায়।
পুড়িছে কি এ অনলে, ভাসিল বা সিন্ধুজলে
তারকাই সে ঘর-ভরীর?
মৌকাডুবি এই কূলে হ'ল কত যাই ভুলে
চলত অতলে মোর নীড়।

প্রাক্-রবীন্দ্র কি বালক-রবীন্দ্র যুগের বাঙালা কবিতার এই চমৎকার উদাহরণের সঙ্গে মনে হয় কি নিচের ইংরিজি লাইনগুলোর কোনো সম্পর্ক আছে?

Is all our fire of shipwreck wood,
Oak and pine?
Oh, for the ills half-understood,
The dim, dead woe
Long ago
Befallen this bitter coast of France!
Well, poor sailors took their chance,
I take mine.

মোটের উপর, ব্রাউনিঙ পকাশিকায় ব্রাউনিঙই যেন অনুপস্থিত। কোনো-কোনো কবিতা খানিকটা কাছে আসতে পেরেছে সেটা মৈত্র মহাশয়ের কৃতিত্ব; মূল ব্রাউনিঙ যে পংক্তিগুলি হয়তো এ-ই প'ড়ে সে খুসি হ'তে পারে, কিন্তু ব্রাউনিঙকে কিছু পেলো এ-কথা ভাবলে সে ভুল করবে। এই অনুবাদগুলোয় ব্রাউনিঙের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যাবে না এ-কথা মৈত্র মহাশয়ের মত রসজ্ঞ ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। ব্রাউনিঙের রস ও সুর বজায় রেখে তর্জমা করা এতই কঠিন কাজ যে তার চেষ্টাতেও গৌরব। যেটাকে এখন পর্য্যন্ত অসম্ভবই বলতে হয়, সেটা সম্ভব করতে পারেননি ব'লে মৈত্র মহাশয়কে দোষ দেওয়া অন্যায় হবে; এবং তাঁর এই দুরূহ চেষ্টার জন্য যথাযোগ্য ধন্যবাদ নিশ্চয়ই তাঁর প্রাপ্য। কোনো একজন বিশেষ বিদেশী কবিকে মাতৃভাষায় মোটামুটি সমগ্রভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা বাঙলাভাষায় এই বোধ হয় প্রথম। এই বই প্রকাশ ক'রে মৈত্র মহাশয় শুধু যে নিজের অসাধারণ কাব্যপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন তা নয়; অনুবাদের দিকে অনেক মূল্যবান কাজের ক্ষেত্র বাঙলা কাব্যে প'ড়ে আছে সে-কথাও আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।

শ্যামলী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, এক টাকা।

সম্প্রতি এক বাঙলা মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় এক 'সমালোচক' আমাদের জানিয়েছেন: 'রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বাঙলাদেশের সকল কবিই নিকৃষ্ট—এত নিকৃষ্ট যে তুলনা বাতুলতা।' বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ নাকি এতই উৎকৃষ্ট কবি যে গদ্যকবিতারূপ 'কচুরিপানা'ও তাঁর হাতে ফুল হ'য়ে ফোটে। তারই দু' একটি ফুলের সন্ধান এই 'সমালোচক' ভদ্রলোক নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্যামলীতে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নাকি শ্যামলী প্রভৃতি বই লিখেছেন 'এই কথা ঘোষণা করিবার জন্য—"ইহা না লেখাই ভালো, কিন্তু যদি নিতান্তই লিখিতে হয়, এই ভাবে লিখিবো।"

গদ্য কবিতা 'যাহার একটুমাত্র লিখিবার ক্ষমতা আছে সেই লিখিতে পারে', কিন্তু 'সমালোচনা' লিখতে হ'লে 'একটুমাত্র' লেখবার ক্ষমতাও দরকার করে না সেটা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলুম। এমনকি, সামান্যতম

বোধশক্তিও না থাকলে তো চলেই, উপরন্তু না-থাকাই ভালো। যে-গদ্যকবিতা 'কাব্যজগতের অপসৃষ্টি' তারই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রে 'সমালোচক' মন্তব্য করেছেন 'অত্যন্ত সুন্দর'। তার কারণ? কারণ তিনি নিজেই জানিয়েছেন: লেখক রবীন্দ্রনাথ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছেন তখন তাঁকে বাহবা দেবার জন্য 'সংযম' 'সংহতি' প্রভৃতি শব্দ কলমের মুখে তৈরিই আছে। অন্যান্য অতি 'নিকৃষ্ট' কবিদের হাতে গদ্যকবিতা হ'লো রাশি-রাশি জাবিশ, শুধু রবিঠাকুরের হাতেই ভালো। রবিঠাকুরের হাতে ভালো হ'লো কেন? বাঃ, হবে না, রবিঠাকুর যে! হিজ মাস্টার্স ভয়েস কানে গেলে চিত্ত চমৎকৃত না-হ'য়ে পারে!

'প্রভু, তোমার সৃষ্টি বুঝতে পারিনে, ক্ষমা করো,' এই কাতর উক্তি ক'রে পায়ে লুটিয়ে পড়াটা যখন বাঙলাদেশের একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকার পৃষ্ঠায় 'সমালোচনা' নামে চলতে দেখি তখন, আর কিছু না হোক, এর প্রকাশ্য নির্লজ্জতাতেই স্তম্ভিত হ'তে হয়। এই ধরণের বুকে-হাঁটা ভঙ্গিতে প্রভুর গৌরব কিছু বাড়ে না, মর্মকরাও লজ্জিত হয়। এই 'সমালোচকে'র মারফৎ জানতে পেলুম যে 'পত্রপুটের ও তাহলীর কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য এইখানেই—তাহারা মুখর নহে।' আমি হাজার লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জোর ক'রেই বলবো যে গদ্যে কি পদ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান বিশেষত্ব ও প্রধান গুণই এই যে তারা মুখর; নদীর স্রোত যেমন মুখর, হাওয়ার যেমন মুখর অরণ্য। রবীন্দ্র-কাব্যকে 'সংহত ও সংযত' বলা অতি নির্বোধ চাটুবাক্য, কেননা 'সংহত ও সংযত' হওয়াই যে কাব্যের একমাত্র মহিমা তা তো নয়। হুইটম্যানের কি সুইনবর্নের কি শেলির স্তুতি করতে গিয়ে কেউ কি তাঁদের 'সংযম ও সংহতি'র তারিফ করে? বরঞ্চ এঁদের—এবং রবীন্দ্রনাথের—রচনার বিশাল ছড়িয়ে পড়ার উচ্ছ্বাসই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ঠিক সহ্য হয় না। মানসী থেকে আরম্ভ ক'রে বলাকা পর্যন্ত, তারপর এই পরবর্তী সমস্ত কাব্যগ্রন্থগুলি মনে-মনে ভেবে দেখুন: বার-বার এ-কথাই মনে হবে যে রবীন্দ্রনাথ একবার বলতে আরম্ভ করলে সহজে আর থামতে পারেন না,

নিজের আবেগের ঝোঁকে কূল ছাড়িয়ে চ'লে যান বন্যার নদীর মতো। অতি সূক্ষ্মভাবে দেখলে, এতে হয়তো তাঁর বিশেষ কোনো-কোনো কবিতার ক্ষতিও হয়েছে। কিন্তু এ-জন্য রবীন্দ্রনাথকে দোষ দেয়া আর তিনি রবীন্দ্রনাথ হ'লেন ব'লে তাঁকে দোষ দেয়া একই কথা। প্রত্যেক কবিকে তাঁর নিজের গঠন-অনুসারেই স্বীকার ক'রে নিতে হয়; ব্যক্তিগত পছন্দমতো কাটছাঁট করতে গেলে হয়তো হারাতে হয় কবির সারবস্তুকেই। সমগ্রভাবে না নিলে কোনো কবিকেই বোঝা যায় না; যেটা কখনো-কখনো মনে হবে কবির দুর্বলতা, সেটাই যে তাঁর মহিমারও উৎসস্থল, এ-কথা সমগ্রভাবে তাঁর রচনা পড়লেই বোঝা যায়।

'এই সকল নিকৃষ্টতর কবিদেরও অনেকেই যথেষ্ট উপভোগ্য কবিতা লিখিয়া থাকেন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবাদা পুষ্ট হইয়াও এই সকল কবিতার সমাদরে বিদগ্ধজনের ব্যাঘাত ঘটে না।' কিন্তু, মুখর নর ব'লে পত্রপুষ্ট আমলীর তান্ত্রিক করেছেন যে-'সমালোচক,' তিনি কোনোদিন রবীন্দ্রনাথের, এমনকি 'নিকৃষ্টতর' কবিদেরও রচনা প'ড়ে বুঝেছেন কিনা সন্দেহ করি। দাস-মনোভাবের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত সত্যি বিরল। কবিদের 'উৎকৃষ্টতা' মাপবার ফিতে তাঁদের পকেটেই থাকে যারা নিকৃষ্টতম কবিও নন; এবং এই ধরণের মূঢ় চাটুকারিতা রবীন্দ্রনাথকেই হাস্যকর করে, এটাই সব চেয়ে বড় দুঃখ।

গদ্য-কবিতা অনেকেই এখনো বোঝেন না কি বুঝতে চান না; এবং না বুঝে, কি ইচ্ছে ক'রে না বুঝে অনেক অসংলগ্ন অর্থহীন কথা বলেন। এঁদের মধ্যে কারো মতামতে যদি সততা থাকে সেটা অশ্রদ্ধেয় নয়। গদ্য কবিতার উপর যদি কারো সত্যিকারের অবিশ্বাস থাকে, সেটা রবীন্দ্রনাথের রচনা পর্যালোচিত না-হবার কোনো কারণ নেই। কেননা যে-জিনিসটাই মেকি, সেটা রবীন্দ্রনাথ লিখলেও মেকি—বিশেষ ক'রে বাঙলায় রবীন্দ্রনাথই যখন সেটা প্রথম চালালেন। আর যদি তাতে কিছু থাকে, সেটা রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও যেমন আছে, অন্যান্য কি অন্য কোনো-কোনো কবিতেও আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এই 'সমালোচক' গদ্য-কবিতার

বৈধ অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, এদিকে রবীন্দ্রনাথের নাম উঠলেই নমো হে নমো। প্রভুর কণ্ঠস্বর শোনামাত্র জিভ দিয়ে কী-রকম লালা গড়ায় তাকে সে একটা দেখবার জিনিস। প্রাতিস্বিক পাভলোভের কথা মনে করিয়ে দেয়। গদ্য-কবিতা কী-রকম হওয়া উচিত সেটা দেখাবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ এ-সব কবিতা লিখেছেন এ-উক্তিও ঠিক নয় যেহেতু এই দৃষ্টান্ত দেখে অন্য যে-কেউ লিখলে সেটা তক্ষুনি 'কচুরিপানা' হবে, কেননা তার লেখক তো রবীন্দ্রনাথ নন। পদ্যপুট শ্যামলী যে ভালো, এর তো আর কোনো কারণ নেই, একমাত্র কারণ এই যে লেখক রবীন্দ্রনাথ।

আমি নিজে গদ্য-কবিতার অনুসন্ধানেই আত্মবান। সকলেই তা হবেন, এখন পর্যন্ত সেটা আশা করিনে; কিন্তু এই ধরণের কাপুরুষ কপটতা ও হাটু-ভাঙা ভাবকতা দেখলে ধৈর্য্য থাকে না। বাঙলা কাব্যে এই গদ্য-কবিতার প্রতিষ্ঠা: একদিন হবে সকল তর্কের অতীত, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অবশ্য কালক্রমে এর নব-নব বিকাশ হবে নতুন কবিদের হাতে; এখনই তো দেখা যাচ্ছে সকলের হাতে গদ্য-কবিতা এক সুরে বাজছে না। পদ্য অনুকরণের প্রাচুর্য্য দেখে ভীত হবার কিছু নেই; সেটা অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। গদ্য-কবিতা যে স্থায়ী ও মূল্যবান তার একটা প্রমাণ এই যে তার রচনাভঙ্গির প্রভাব পড়েছে আমাদের পদ্যের উপরেও। পদ্যের পদ, মাত্রা-সচেতন, ইস্ত্রি-করা পোষাকি ভাবটা ক্রমেই কেটে যাচ্ছে, অনেক এগিয়ে এসেছে মুখের ভাষার দিকে। রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক পদ্যে এবং আধুনিক কবিদের পদ্যরচনায় এ-জিনিসটা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার।

গদ্য-কবিতা ইংরিজিতে অনায়াসে মেনে নিতে পারি, কিন্তু বাঙলায় তাকে কিছুতেই আমল দেবো না, এটা আমাদের জাতিগত ধাসদোষেরই একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে নিতে হবে। ভালো লাগা কি ভালো না-লাগা নিয়েই কথা। ভালো যদি লাগলো সেখানেই তো মিটলো তর্ক। কিন্তু অনেকে হয়তো সহজ ভালো লাগাকে জোর ক'রে ঠেকিয়ে রেখে তাত্ত্বিক

তর্ক তোলেন, নাম নিয়ে ঝগড়া বাধান। শ্যামলীর অন্তর্গত 'শেষ পহরে' কি 'রবিতে' যার ভালো না লাগবে, কোনো কবিতাই বোধ হয় তাঁর ভালো লাগে না। এই ধরণের নাটকীয় কবিতা—আমাদের অতিপরিচিত জীবনের ছোট-ছোট ছবি—গদ্য-কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ঝোঁকটা খুব বেশি ক'রেই এদিকে। যেন জীবনের কত ছেঁড়া পাতা বিস্মৃতির হাওয়ায় উড়ে যেতে-যেতে কবির কল্পনায় আটক প'ড়ে গেছে। পুনশ্চ পরিশেষ উভয় গ্রন্থই এই জাতীয় রচনায় ভাণ্ডার। গল্পকার মত সম্পূর্ণ ও নিটোল গল্প নয়, একটুখানি গল্পকে ঘিরে মস্ত উজ্জ্বল ভাবমণ্ডল। 'সন্ধ্যাবেলা' ও 'অকালঘুম' এ দুটি কবিতাও সেই জাতের। 'যাকে খুব জানি তাকেও সব জানিনে এই কথা বলা পড়ে কোনো একটা আকস্মিকে', যেমন হঠাৎ চোখে পড়ে প্রিয়ার প্রসাধন কি দেখা যায় তাকে অসময়ে সন্ধ্যাবেলায় ঘুমোতে, এক-একটি আশ্চর্য্য মুহূর্ত্তে যেন সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা উদ্ভাসিত। এ ছাড়া, শ্যামলীর সিরিজ জাতীয় কবিতা-গুলোয় পড়েছে পড়ন্তবেলার রোদ্দুরের ঝিকিমিকি; সুতিা বলতে, পূরবী থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ স্মৃতিকবিতার মূল কথা হচ্ছে 'মনে পড়ে।'

এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত কিছু হারানো-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ছিঁড়ে-হয়ে-যাওয়া গান,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
ভাঙাহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূলোয়,
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা অন্যমনস্কি···।

প্রশান্তি নেমেছে কবির চিত্তে, অতল অকূল প্রশান্তি, দীর্ঘ কবিজীবনের শেষ পুরস্কার। যেন বিকেলের আকাশের বুকের মধ্যে একটি নিঃশব্দ গভীর সুষ্টি পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে চ'লে যাচ্ছে;

তোমরা এসেছ তর্ক নিয়ে।
আজ দিনান্তের এই পড়ন্ত রোদ্দুরে
সময় পেয়েছি একটুখানি :
এর মধ্যে ভালো নেই মন্দ নেই,
নিন্দা নেই খ্যাতি নেই।
দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই,
আছে মনের সদর,
জলের ঝিকিমিকি,—
জীবনস্রোতের উপকূলে
আজ একটু কাঁপন, একটু কল্লোল,
একটু ঢেউ।
আমার এই একটুখানি অবসর
উঠতে চলেছে
অনাগতী পত্তনের মতো।
সূর্যাস্তবেলার আকাশে
দিনের ডানার খেলা শেষ করতে
বৃথা প্রশ্ন কোরো না।

এই বিরতি, এই অপরূপ সোনালি অবসর কথা ক'য়ে উঠেছে নানা সুরে নানা পরিবেষে কবির সমস্ত আধুনিক কাব্যে। শ্যামলী এর ব্যতিক্রম নয়। 'আমি' কবিতায় 'ব্যক্তিহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্বে'র বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির অফুরন্ত রঙিন ঐশ্বর্যকে তিনি গীত করিয়েছেন। এ সমস্যা মুখ্যত আধুনিক। সকল প্রশ্ন তিনি এড়াতে চান, কিন্তু প্রশ্ন তাঁকে ছাড়া দেবেই, যেহেতু তাঁর মন প্রশান্ত হ'লেও অসাড় নয়, অতীতের স্মৃতিসমন্বিত হ'লেও বর্তমান সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নয়। তাঁর মনীষার তীব্র সচেতনতা এখনো দেখা যাচ্ছে কত নতুন-নতুন কথায় ও উপমায়, কাব্যের কত নতুন প্রকাশভঙ্গিতে, কত নবাগত সমস্যার অঙ্গীকরণে।

মন তাঁর অবিশ্রাম গতিশীল ; গীতাঞ্জলির গভীর আত্মস্থতায় এখনো নিশ্চিন্ত থাকলে এ-প্রশ্ন তিনি করতেন না—

পথিক বলছেন—

বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চক্ষুর চাপি ভার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর শীতরের কাছে।...
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
যুগে যুগান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে যা কোনোখানেই—
"তুমি সুন্দর"
"আমি তালোবাসি।"
বিধাতা কি আমার মনের সাধনা করবে
যুগ-যুগান্তর ধ'রে,
প্রলয়-সন্ধ্যায় জপ করবেন.—
"কথা কও, কথা কও,"
বলবেন, "বলো, তুমি সুন্দর."
বলবেন, "বলো, আমি তালোবাসি ?"

এ-ই তো প্রশ্ন। এবং এ-প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথের মুখেও আজ নেই।

বুদ্ধদেব বসু

চিঠি-পত্র

সিংহিজান,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৭।

"কবিতা" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন বলছেন যে, যেটা কাব্য সেটা পদ্যে হলেও কাব্য গদ্যে হলেও কাব্য, তখন বিতর্ক শোভা পায় না। এখন কেবল একটি জিজ্ঞাস্য থাকে।

রবীন্দ্রনাথের "বিচিত্র প্রবন্ধ," "ছিন্নপত্র," "গল্পগুচ্ছ," "ঘরে বাইরে" ইত্যাদি অসংখ্য গদ্যগ্রন্থে এমন অংশ কি হাজার দশেক নেই যাকে কেটে নিয়ে পদ্যের মত করে ছাপলে আরো সকাশখার। "পুনশ্চ" তৈরি হয়, যাকে তর্জমা করে পদ্যের মত করে সাজালে আরো অনেকগুলি ইংরাজী "গীতাঞ্জলি"!

রবীন্দ্রনাথ কেন, বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র যতীন্দ্রলাল বিভূতিভূষণ অচিন্ত্যকুমার বুদ্ধদেব প্রেমেন্দ্র প্রবোধকুমার প্রকৃতির গদ্য কি স্থলে স্থলে কাব্যের পর্যায়ে পদার্পণ করেনি। সাজাতে জানলে বহু সহস্র কবিতা কি আজই বাংলা কবিতায় চলনিকায় সন্নিবিষ্ট হয় না।

আমি ত দেখছি পদ্যের অনুকরণে সাজানো ছাড়া আধুনিক কবিতায় অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা পুরাতন গদ্যের ছিল না। পদ্যের অনুকরণে সাজানো বলেই এই বিনিব কবিতা বলে কাটছে, ঐ অনুকরণটুকু ছাড়লে এর বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে না।

কাব্যরসের দিক থেকে বিচার করলে ল্যাম্ব, লী হান্ট, ডি কুইন্সি, পেটার, রাস্কিন যত শত প্রবন্ধ লিখেছেন তার অধিকাংশই কবিতা।

অথচ কোনো ইংরাজি কাব্যসঙ্কলনে তাঁদের দর্শন পাওয়া যায় না। হয়ত নামের দুই একটি মাকারি পদ্য দেওয়া থাকে।

"সকবিতা"র পরবর্তী সংস্করণে আশা করি "বিচিত্র প্রবন্ধ," "ছিন্নপত্র" ও "গল্পগুচ্ছ" থেকে কিছু কিছু ও "লিপিকা" থেকে বেশী বেশী "কবিতা" থাকবে। ইতি।

বিনীত
লীলাময় রায়

পুনশ্চ—

রবীন্দ্রনাথ "গদ্যকাব্য" নামে একটি কথা ব্যবহার করেছেন। পদ্যে যা লেখেন তা কি "পদ্যকাব্য ?"

সম্পাদকীয় মন্তব্য :—কবিতা যখন পদ্যেও হ'তে পারে, পদ্যেও হ'তে পারে তখন পদ্য-কাব্য কথাটার বৈধ প্রয়োজন আছে। পদ্যকে পদ্য-কাব্য বললে ভুল হয় না, হয়তো বাহুল্য হয়, যদিও পৃথিবীতে অনেক পদ্যই দেখা গেছে যেটা কাব্য নয়। এমন অনেকে আছেন যাঁরা সেই শ্রেণীর পদ্যকে অনায়াসেই কবিতা ব'লে গ্রহণ করেন, মানেন না লিপিকাকে। কিন্তু লিপিকার গদ্যগুলি কবিতাই, লীলাময়ের ফুট কোটেশন-মার্কা সত্ত্বেও। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে ওগুলো কবিতার মতো ক'রে সাজাতে গেলেও শেষ পর্যন্ত সাজানো চলে না। অবশ্য সাজানোতে কিছু এসে যায় না। গদ্য কবিতা পদ্যের মতো ক'রেই সাজানো হ'তে পারে, সেই সঙ্গে কবিতাও হ'তে পারে। ইংরেজি সাহিত্যে এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

তবে ছিন্নপত্র কি পরলা নম্বর কবিতা হবে না কেন ? হবে না এই কারণে যে ছিন্নপত্র চিঠি এবং পরলা নম্বর গল্প। উভয় রচনাতেই যথেষ্ট কাব্যরস আছে, কিন্তু সমগ্র জিনিসটা যে কবিতা নয় এটাও কি ব'লে দিতে হবে ? গদ্যে ডিকুইন্সির রচনা সম্বন্ধেও সেই কথা। তাঁদের রচনায় কবিত্বের অভাব নেই ; কিন্তু তাই ব'লে তা থেকে এমন অংশ হয়তো খুব বেশি বার করা যাবে না, যাকে (সাজাবার কায়দা সত্ত্বেও) অভিজ্ঞ পাঠকের একটি কবিতা ব'লে ভুল হবে। থাকবে না রূপের সম্পূর্ণতা, থাকবে না রসের সংহতি। তাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি না দেবার

তাতে অন্তকোর্ড যুক্ত অব ইংলিশ ভার্সের সম্পাদককে কোথে দেখা যায় না।* কিন্তু কোথে মিলতেই পারে যাইবলের সং অব সংগ নেই ব'লে, হুইটম্যানের ও ক্যান্টেন যাই ক্যান্টেন ছাড়া বিশেষ কিছু নেই ব'লে। কেননা সলোমনের কি হুইটম্যানের গান রচনায় ও প্রেরণায় সর্বোপরি নির্মাণ-কৌশলে ও ধ্বনি-বিন্যাসে সম্পূর্ণ ও অখণ্ড কবিতা. এ-বিষয়ে সন্দেহ তাঁরাই করবেন যাঁরা কবিতা বলতে বোঝাই পছ বোঝেন।

সম্প্রতি ইয়েট্‌স্ সম্পাদিত একটি ভূমিকায় ইংরিজি গীতাঞ্জলি স্থান পেয়েছে। ইংরিজি গীতাঞ্জলিকে আমরা তো কবিতা ব'লেই জানি, মূলের চাইতে তার মূল্য একটুও কম বলি না. বরিও বাঙলা গানগুলি পড়, তার উপর গান, এবং ইংরিজিটা গদ্য এবং গদ্যের মতোই সাজানো। একটা জিজ্ঞাস্য : ইংরিজি গীতাঞ্জলিকে লীলাময় কি কবিতা ব'লে মানেন না? হুইটম্যানকে কবি ব'লে? পাউণ্ড. এলিয়ট, এইচ-ডি, ডি এইচ্ লরেন্সকে? পাউণ্ডের ঢালে কবিতাগুলো কি তাঁর কাছে কবিতা ব'লে মনে হয় না? যদি হয়. তাহ'লে ইংরিজিতে যেটা হ'তে পারলো বাঙলায় সেটা হ'তে পারবে না কেন? আর যদি না হয়, যদি তিনি কবিতা বলতে বোঝাই শুধু পদ্য বোঝেন. তাহ'লে তো এই আলোচনারই কোনো দরকার ছিলো না। এই ভিন্নতেরির যুগে প্রত্যেকেরই স্বীয় মতে অধিকার আছে, সে-মত যদি এও হয় যে ইংরিজি গীতাঞ্জলি কবিতা নয়!

---

* এ-প্রসঙ্গে এটা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে ইয়েট্‌স্-এর দ্বারা-প্রকাশিত অক্সফোর্ড যুক্ত অব মডার্ন ভার্সের প্রথম কবিতা হচ্ছে পৌত্তারের না তিনি প্রথম থেকে খোলা লিখা পড়তে বিশ্বাস করেননি লাইন—পদ্যের মতো সাজানো। লীলাময় নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ্য করেছেন?

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু। প্রোপ্রাইটর [illegible]। সহকারী সম্পাদক : সমর সেন
৫ ও ৬ চিন্তামণি দাস লেন মিত্রালয় প্রেস হইতে প্রভাতচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

কবিতা

দ্বিতীয় বর্ষ আষাঢ়, ১৩৪৪ চতুর্থ সংখ্যা

স্মরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন রবো না আমি মর্ত্যকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
হেথা এই চৈত্রের শালবন।
হেথায় যে মঞ্জরী দোলে শাখে শাখে
গুঞ্জ নাচায়ে যত পাখী গায়,
ওরা মোর নাম ধ'রে কভু নাহি ডাকে
মনে নাহি করে ব'সে নিরালায়।
কত যাওয়া কত আসা এই ছায়াতলে
আনমনে নেয় ওরা সহজেই
মিলায় নিমেষ যত প্রতি পলে পলে
হিসাব কোথাও তার কিছু নেই।
ওদের এনেছে ডেকে কোন্ দখীরণে
ইতিহাস-লিপিহারা সেই কাল
আমারে সে ডেকেছিল কভু বনে বনে
বক্ষে বাজায়েছিল তারি তাল।

সেদিন ভুলিয়াছিনু কীর্তি ও খ্যাতি
বিনাপণে চলেছিল ভোলা মন,
চারিদিকে নামহারা ক্ষণিকের জাতি
আপনারে করেছিল নিবেদন।
সেদিন ভাবনা ছিল মেঘের মতন
কিছু নাহি ছিল ধরে রাখিবার,
সেদিন আকাশে ছিল রঙের স্বপন,
স্বয়ং ছিল উড়ো ছবি আঁকিবার।
সেদিনের কোনো দানে ছোটো বড়ো কাজে
স্বাক্ষর দিতে দাবী করি নাই,—
যা লিখেছি যা মুছেছি শূন্যের মাঝে
মিলায়েছে, দাম তার ধরি নাই।
সেদিনের হাওয়া আমি,—চিহ্ন বিহীন
পথ বেয়ে কোরো তার সন্ধান,
হারাতে হারাতে যেথা চলে যায় দিন,
ভরিতে ভরিতে ডালি অবসান।
মাঝে মাঝে পেয়েছিনু আহ্বান গীতি
যেখানে কালের সীমা-রেখা নেই,—
খেলা করে চলে যায় খেলাবার সাথী
দিয়েছিনু সাড়াহীন সেখানেই।

দিই নাই, চাই নাই রাখিনি কিছুই
ভালোমন্দের কোনো জঞ্জাল,
চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভুঁই
আসন পেতেছে মোর ক্ষণকাল।
সেইখানে মাঝে মাঝে এল যারা পাশে
কথা তার কেলে গেছে কোন্ ঠাঁই;
সংসার তাহাদের ভোলে অনায়াসে,
সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।
বাসা যার ছিল ঢাকা অনন্তার পারে,
তাহারাদের সাথে মিল যার,
যে-আমি চাহনি কারে ক্ষণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার।
সে-আমারে কে চিনেছ মর্ত্যকারায়,
কখনো স্মরিতে যদি ধর মন,
ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

টুয়া-টুংরি

(শ্রীসময় সেন-কে)

বিষ্ণু দে

তোমার পোস্টকার্ড এল,
যেন ছড়টানা স্রোতে
সিংসিকাটোর আকস্মিক ঘূর্ণী,
রেক্তিওর ঐক্যতানে বিস্মিত আবেগ।

দিন কাটল
যেন জিল্‌হাবিলম্বিতে।
গানের কলির অলিতে গলিতে
বাস্ সেল, ফ্লাস্ গেল কালের অন্তযাত্রায় কেটে।
অঁদিয়েল প্রোকেন্সরের মাথায় ন্যাড়া
ব্যর্থাতীত ক্ষমায় আকাশে প্রথম করুণার আশীর্বাদ।
কাব্যেই হল কল্পনা ; কল্পনায় কাব্য
সেইদিন প্রথম।

নাম্‌ল সন্ধ্যা,
সূর্যদেব, এখানে নাম্‌ল সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা
পিলু বারোয়ার সন্ধ্যা।
একাকার এই ভ্রাব মায়ায়
জাগরহৃদয়ের গোধূলিলগ্নে
তবু বীণাতে একটু আলো এল
তোমার পোস্টকার্ড,
আর এল তোমার ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক।

সূর্যদেব, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে' চলে' যাক্।

বাসের একি সিংভাঙা গোঁ!
যন্ত্রের এই ঘামখেয়াল!
এদিকে আর পঁচিশমিনিট—
ওরে বিহ্বল, ওরে বিহ্বল ঘোর।
ঘেন্নাভরা ছেড়ে বৈরাচারী ট্রামই ভালো,
ইচ্ছার দাসিত্বহীনতা ছেড়ে সংস্কারের বাঁধা সড়ক।

বড়োবাজারের উপলউপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উপচিয়ে কেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া
আর পানের পিক্
আর দীর্ঘশ্বাস
বড়োবাবুর গঞ্জনায়
বড়োসাহেবের কটা চোখের যাতনায়
দাম্পত্যমিলনের ভ্রান্ত সম্ভাবনায়
অপত্যাধিক্যের অনুশোচনায়
ট্রামের বাসের কারের কেরিওয়ালার কলরোলে
এই ক্লান্ত, তাদ্‌হসি লাবন্‌দ্‌ বেঞ্চের ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের
ক্লান্ত নীরবতায়
ভিক্ত গুঞ্জনে
শুধু অস্পষ্ট একটা বিরাট লাগ্‌ভাঁট আওয়াজ
যেন শিশিরভেজা মাটিতে পাতাঝরার গান
যা যেন একটা বিরাট অন্তহীন দীর্ঘশ্বাস
বড়োবাজারের ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অমর আকাশে
তারায় তারায় কাঁপন লাগে যার মীড়ে মীড়ে।

নিতে হল ট্যাক্সি।
নতুন ত্রিশে কি ট্রামলাইন পাততে ওরা?

হে বিরাট নদী!
স্টীমারের বাঁশী
খালাসীর গান
সবশেষেছির দেশে
ককেনের দেশে
যত কিছু বই ছিল সব পড়ার শেষে
ক্লান্ত রক্তের বিবর্ণ আবেশে
স্টীমারের বাঁশী
আর খালাসীর গান!

ট্যাক্সিরা থমকে দাঁড়ায়, ছোটে যায়
বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের, চোঙার বোঝায়
পন্টুনের ফাঁকে ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলস্রোতে।
জলস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,
আগে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিপড়ের সার,

কবিতা

জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে শোষণকারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে
পিপড়ের সারি
অগণন ভিড়াক্রান্ত হে সহর, হে সহর স্বপ্নভারাতুর !

পাঁচমিনিট, পাঁচমিনিট মোটে
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
উদাম উধাও
ট্রেন এল বলে' হাওড়ায়।
    যে স্টল্ এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়ের হাওড়া,
তারি মধ্যে বসে আছেন শিবদাগর
ট্যাক্সির ড্রাইভারে, ট্যাক্সিতের এটাক্সিয়ায়।

এল ট্রেন
মন্থিত করে' রক্তের জোয়ার
আমারই একান্ত মহচৈতন্য মন্থিত করে',

দেখলুম তোমার ক্লোজ্-আপ্ মুখ আবলীন,
—একটা খুশি—
শুনলুম যেন ভোরবেলাকার ট্রেনটাতে।
হায়রে! আমার হলনে খুশি!
কোথায় তুমি! ট্রেন ত এল!
কম্বলখানি খসে' পড়ুক,
ধর্মঘট নাই বা থামুল,
ট্রেন ত এল!
তোমার কি অসুখ হল?
তোমার বাবার?
হঠাৎ দেখি লাবণি
বল্লে, এই যে, কি খবর,
আমার জন্যে এলেন নাকি?
দিদি আসবে সাতুই।
ভেবেছিলুম তন্ত্রালসা সন্ধ্যার গোধূলি ছায়ায়
ট্যাক্সির নিঃসঙ্গ মায়ায়
ট্রেনের ছন্দে স্পন্দিত তোমার হৃদয়ের পানে
হাতে হাত উৎকণ্ঠায়
করব সেই চরম প্রকাশ, সেই পরম যবনিকামোচন! হায়রে!
—আমার বাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব কোন্ খেয়ালের
বাঁকা খালে?
কোন্ রূপসী অবলম্বনের নিস্রাহীনতায়?

নবজন্ম

হেমচন্দ্র বাগচী

শিশির, দূর্বা, সকালের রৌদ্রে মাকড়সার জালের ঝিকিমিকি—
একটি ছোট মেয়ে কাঁদছে—ওরা, ওরা, ওরা—
পেঁপে গাছের ডাল-ডাল পাতার উপরে এসে পড়েছে শীতের রৌদ্র।
তা'র নীচে খানিকটা বেড়া দেওয়া জমিতে
পালংশাক, সিম, বড়বটির ক্ষেত—
লাউ-এর মাচা থেকে লাউলতা আর পরিপুষ্ট মস্থণ লাউ
ঘনসন্নিবদ্ধ রমণীয় মত পত্রপল্লবের আবরণে লুকিয়ে আছে।
যেদিকে চাই, একটি স্নিগ্ধ শোভন শ্যামলতা
অস্পষ্টতার আবরণ কাটিয়ে শীতের নীল নির্মল আকাশের নীচে
পাণ্ডুর সূর্য্যালোকে ঝল্‌মল্ করে।

অবনতমুখী পৌরনারী, আর অবাধিত প্রাণপ্রাচুর্য্য :
কিটা ক্রমাগত যন্ত্র যন্ত্র ক'রে বকছে—
কে একজন মানপাতার উপরে
ছোট ছোট বড়ি দিচ্ছেন রৌদ্রে পিঠ্ দিয়ে,
খেজুর রসের জন্য ছেলেরা বায়না ধরেছে
মাঝে মাঝে উদাস উত্তরবায়ু ব'য়ে চলেছে
অশ্বত্থের জীর্ণ পাতা ঝরিয়ে।

মনে হয়, এই চিরউদাসিনী পৃথিবীতে
আবার নূতন ক'রে জন্মেছি—
ধরিত্রী যেন তাঁর প্রচ্ছন্ন গর্ভাবরণ উন্মুক্ত ক'রেছেন—
তা'রি ফাঁকা দিয়ে নীল অবারিত আকাশ
আর যৌবনশ্রীর প্রদীপ্ত সুন্দর মুখ দেখলাম—
প্রদীপ্ত সূর্য্যের সিন্দূর-রাগে তাঁর ঘন কেশদীঘি আরক্তিম
পূর্ণ তাঁর আবরণ উন্মোচন ক'রেছেন,
মনে হ'ল নবজন্ম পেয়েছি।

"স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু"

হেমচন্দ্র বাগচী

প্রতিরাত্রে আমি হংসপদিকার গান শুনি
বিরহিণী হংসপদিকা—
বহুবল্লভ দুষ্মন্তের শুভান্তবিহারিণী।
স্বপ্নে আমি চ'লে যাই কালিদাসের কালে
যখন নদীকান্তারনগরীতে সমাচ্ছন্ন সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ
কবির কাব্য যখন মেঘলোক থেকে মাটির পৃথিবীকে
প্রিয়ার পদন্যাসের সঙ্গে উপমা দিতে অধীর—
স্বপ্নে আমি সেই কালে অবতীর্ণ হই
আর গান শুনি হংসপদিকার—
রাজউপবনে বিরহিণী নারীর মৃদু গুঞ্জরণ
মনে হয়, এ স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম!

প্রতি রাত্রে আমি আমার প্রিয়তমার গান শুনি
প্রোষিতভর্তৃকা প্রিয়তমা—
গৃহযাতায়নপার্শ্ববর্তিনী কল্যাণী বধূ—
স্বপ্নে আমি নেমে আসি আধুনিকের কালে
যখন পীড়াজর্জর ক্লান্ত জীবনে অবসন্ন দুর্গত,

কবির কাব্যে যখন আর প্রিয়া নেই
প্রিয়ার নখনে যখন আর সন্ধানিত হয় না কবির কাব্যে
বিচিত্র মুখের উপমায় আর অলঙ্কারে ;—
তখন আমি গান শুনি—
তীব্র হাসজীবনের গান—
কঙ্করে আর তপ্ত মরুবালুকায়
দুঃখিনী প্রিয়তমার মুখের রেখা অঙ্কন করি
মনে হয়, এ বিরহ, না মিলন, না মৃত্যু !

প্রলাপ

হেমচন্দ্র বাগচী

হঠাৎ জ্যোৎস্নাধারায় কতগুলি পাখী উড়ে গেল—
দূর বনান্তরের দিকে।
অদ্ভুত চাঁদের আলো পড়েছে নারকেলগাছের ঝিরিঝিরি পাতার উপর
রৌপ্যশুভ্র আলো এবং পত্রান্তরালের ঘন অন্ধকারের আল্‌পনা—
তা'রা কোন্ দেশের পরী, যা'রা এই আল্‌পনা দেয় ?

ট্রেন লাইনের দু'পাশেই গ্রাম—
ঘন বনের মধ্যে দৃষ্টি চলে না।
পুরোনো ভাঙা ভাঙা বাড়ী
কত পরিচিত অপরিচিত গাছে মেশামিশি
চাঁদের আলো সেই গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

মানুষ জেগে থাকে না কেউ,
অন্ধকার রাত্রে হুইস্‌ল্ দিয়ে ট্রেন আগিয়ে চলে।
ইঞ্জিন থেকে আরম্ভ ক'রে
সমস্ত গাড়ীগুলোর উপরে পড়ে
রৌপ্যশুভ্র চাঁদের আলো।

গাড়ীর ধাবমান ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোও আগিয়ে চলে।
মনে হয়, সারারাত ধ'রে শিশির ঝ'রে পড়ছে
সাহারা মরুভূমিতে
তৃষার্ত্ত মরুভূমি বুঝি স্নিগ্ধ হ'ল।

পোড়ো স্তিটের পাশ দিয়ে
সুপ্ত চন্দ্রালোকিত গ্রামের উপর দিয়ে
সর্ষে ক্ষেতের উপর দিয়ে গাড়ী চলে—
চাঁদের আলোর স্নিগ্ধ যৌগাণ্ডত্র রঙ্—
তা'র কাছে যেন সব একাকার হ'য়ে গেছে।

দেবদারু ও চাঁদ

হেমচন্দ্র বাগচী

দেবদারু গাছের পাশ দিয়ে যখন চাঁদ ওঠে
পথ চলতে চলতে মনে হয়—কি সুন্দর!
কোনো সুন্দরী নারীর মুখও বুঝি অত সুন্দর নয়—
আর, তরুণী প্রিয়া যখন মুখ রাখে তা'র মুখের পাশে
তখন মনে হয়, চাঁদও বুঝি অত সুন্দর নয়।
চাঁদকেও ভোলা যায় না, তরুণী প্রিয়াকেও ভোলা যায় না।

আদিম দেবতারা

জীবনানন্দ দাশ

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
তোমাকে দিল রূপ—
কি স্বভাবহ নির্জন রূপ তোমাকে দিল তারা ;
তোমার সংস্পর্শের মানুষের রক্তে দিল মাছির মত কামনা।

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
আমাকে দিল লিপি রচনা করবার আবেগ
যেন আমিও আগুন বাতাস জল,
যেন তোমাকেও সৃষ্টি করছি।

তোমার দুখের রূপ যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়,
যেন নিশীথ দেবতাকি দ্বীপ ;
কোনো দূর নির্জন নীলাভ দ্বীপ যেন।

ফুল হাতে ব্যাবহৃত হয়ে তবু
তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছ ;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি দূরের দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর।

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বন্দিম পরিহাসে
রূপের বীজ ছড়িয়ে চলে পৃথিবীতে,
ছড়িয়ে চলে স্বপ্নের বীজ।

অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ?
জল কেন নির্জন দেবদারু বীথির নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই বাহুবীর রূপ ?
খুন হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে—
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল :
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে মূল্যের মাপ হয়ে যায় ?

হো হো করে হেসে উঠলাম আমি !—
চারদিককার অট্টহাসির ভিতর একটা বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে
অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হয়ে উঠল যেন ;
পৃথিবীর সমস্ত জল একটা বিরাট তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মত
একটা বীভৎস পাতাল সমুদ্রের উত্তাল উত্তাপে
চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আর্তনাদ করতে লাগল।

মুহূর্ত

জীবনানন্দ দাশ

আকাশে জ্যোৎস্না,—বনের পথে চিতাবাঘের গায়ের ঘ্রাণ ;
হৃদয় আমার হরিণ যেন :
রাত্রির এই নীরবতার ভিতর কোন্ দিকে চলেছি !
কপালি পাতার ছায়া আমার শরীরে,
কোথাও কোনো হরিণ নেই আর ;
যতদূর যাই কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ
শেষ সোনালি হরিণ-শস্য কেটে নিয়েছে যেন।
তারপর ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে
শত শত মৃগীদের চোখের ঘুমের অন্ধকারের ভিতর।

পাহাড়ের রহস্য

নিহিরকুমার বসু

চালু পাহাড়খানি
তার চড়াই উৎরাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে
দেখছে ভাঙাচোরা দুঃস্বপ্ন।
আর দূরে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামল বনানী
আকাশের নীলিমাকে সে দিবারাত্র বিহ্বল করছে
আপনার রূপের মোহে।
পাহাড়ের পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট মেঠো পথ
দিগন্তের উদ্দেশে সর্পিল গতিতে চলে গেছে,
তার উপর দিয়ে ভোরবেলা লাঙল কাঁধে
একটি দুটি কৃষাণ মন্থরগতিতে চলে,
যেমন করে চলে জীবনযাত্রা অলসভাবে
সময়ের সিঁড়ি বেয়ে।

কাল রাতে কিসে যেন পেল আমাকে
শয্যা ছেড়ে উঠে
দাঁড়ালাম বাইরে এসে,

দেখতে পেলাম অস্পষ্ট দৈত্যের মত
ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়খানি
পৃথিবীর বোঝা মাথায় নিয়ে।
হঠাৎ মনে হ'ল যেন রাতের জমাট অন্ধকারে
পাষাণ পাহাড় তার বোবা মনের দুয়ার খুলে দিল,
বহুযুগের পুঞ্জিত কথাগুলি
বাতাস বেয়ে ছড়িয়ে গেল আকাশময়,
যেখানে সহস্রকোটি তারা বিরহী পৃথিবীর জমাট অশ্রুর মত
টল্‌টল্ করছে আপনার ব্যথার ভারে।
মনে হোলো রাতের অন্ধকার প্রাণ পেয়েছে
বহুদিনের পুরোনো কথাগুলির স্পর্শে;
দূর বনানীর পাতায় পাতায় কোন অবাক বেদনা
শিরশির করে উঠল।

এমনি রাতের অন্ধকারে,
—যখন পৃথিবীর জীবনস্রোত থমকে থাকে—
এই পাহাড় থেকে উঠে আসে
সহস্র বৎসরের পৃথিবী
সহস্র বৎসরের লুপ্ত কথাগুলি ছাড়া পেয়ে
প্রেতের মত নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায়;

তা'রা স্বপ্ন আনে তারার চোখে,
তা'রা সাড়া তোলে নিঝুম বনানীর মর্মমূলে।

হঠাৎ চমকে দেখি
আলোর রেখা ফুটে উঠেছে দূর আকাশে,
নীড়ের বাঁধন ছিঁড়ে পাখীগুলি
একটি ছুটি করে বেরিয়ে পড়ছে আকাশে,
ঘুমন্ত পৃথিবী তার স্বপ্ন ভেঙে নড়ে চড়ে উঠ্‌ছে।
হঠাৎ কি শিহরণ যে পাহাড়ের বুকে লাগল,
বন্ধ হল তখনি তার মনের দুয়ার,
তারারা ডুব দিল সব আলোর স্রোতের তলে,
আর মুখর বনস্পতির দল
কিসের লজ্জায় যেন নীরব হোলো।
তাকিয়ে দেখি ঢালু পাহাড়খানি দাঁড়িয়ে আছে
চিরকালের মত নিশ্চল, নিথর।

প্রতিষ্ঠা

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

করেছি একটা সাংঘাতিক পণ,
শোনো তোমরা।
বিশ্বাস না হয়, মিছে হেসো না
চুপ্‌টি করে শোনো।
দোহাই তোমাদের, তর্ক তুলো না—
তর্কে দেবতা মেলে না।

সরস্বতীকে ঘরে আনবো
পণ করেছি আমি।
অপ্রতীত্ত মনে হয়? শোনো তবে—
মরাল-বাহনা সে নয়,
হরাল-গমনা।
হাতে তার বীণা নেই,—কণ্ঠে আছে মধু।
বাণী একটু অস্ফুট—হয়তো শুভ্র নয়,
কেমন যেন জড়িয়ে-যাওয়া।
তা' হোক্,
প্রস্ফুটনী অধর দিয়ে শোধন করে নেবো।

…হাসির কথা নয়।
মস্তানি মহাদেব হাসেন আপন-ভোলা হাসি,
মস্তানি গৌরী দেন গালে হাত।
নবীন তপস্যার সিঁড়ি ভেঙে
হেসে দেন উড়িয়ে সকল
আশা-ভরসাকে।
বলেন—"পাগল! বামন হয়ে চাঁদে হাত!
স্থির করে রেখেছি যে আমরা
সরস্বতীকে দেখো তারি হাতে—"

—যিনি আসছেন—শীঘ্রই আসছেন
ক্ষীরোদ-সাগর পার থেকে।
গলায় দোলে সিবিল্ সার্বিসের
সদ্যমোতির মালা।
এক হাতে শাশ্বতীর বরাভয়-শঙ্খ,
অন্য হাতে অনেশী কূটনীতির
মন্ত্রভেদন চক্র।

আর এক হাতে স্বস্তর-নিপীড়ন
যৌতুকের গদা—
শেষ হাতে কালচারের
বিদেশী শ্বেতপদ্ম।

হায় রে! আমার শুধুই নীলাকমল।
চার মনায় এক।
কিন্তু তোমাদের আশীর্বাদে তাইতেই হয়েছে কাজ।
ওই দেখো—লোধ্র-রেণু লেগে আছে
সরস্বতীর দেহে, পরিপাণ্ডুর কপোলে।
তোমরা শোনো, যারা হেসেছিলে—দেবী আমার শুধেই ছুঁই।
হবে না? সিঁড়ি যে আমার স্বচ্ছ জয়ী।
কালিদাসের অন্নগত শিষ্য—
চায়ের পেয়ালায় তোত্রযোগে মিশিয়ে দিয়েছি
বেশ একটু আদিরসের ঝাঁজ।

লক্ষ্মীদিদির সঙ্গে আমাদের উত্তরেরই কলহ।
বাপ-মায়ের ছয়ো-মেয়ে তিনি থাকুন্ গে,
ওঁর ত্রিলোক-পালন হাকিম-স্বামীর বুকে
কৌস্তুভমণিরূপে।

আমরা যাবো দূরে দূরে—বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠে
কমলবনের পাশে—যমীর দূরে।

আগামী শীতশেষেই তাকে ঘরে আনবো
পণ করেছি—আর দেরী নয়।
ইতিমধ্যে কখন কি ঘটে
বলা তো যায় না!
বসন ছুপিয়ে রেখেছি বাসন্তীরঙে
তাতে পড়েছে অমলা শিউলীর
রঙীন্ ফোঁটা।
তোমাদের রইলো নিমন্ত্রণ—
হেসো কিন্তু এসো,
ফেল ফুলো না।

বন

নীলাম্বর বসু

বহুদাবনের মর্মরধ্বনি
তালে তালে হয়েছে রকম পাখীর কিচিরমিচির ধ্বনি,
একটু পরে সন্ধ্যা নামে
সবুজের তরঙ্গ যেখানে নীলাকাশের সঙ্গে মিশেছে,
মোহময়, অপরূপ সন্ধ্যা,
শিশির-ভেজা পত্রের পাপড়ি-মেলার মতো
সন্ধ্যার উন্মীলন।
তারপর, একেবারেই শুরু গভীর রাত্রি।
পথে, পথপ্রান্তে, বনমধ্যে
খসে-খসে পড়ে শুরুতার চূর্ণ,
অন্ধকার পড়ে ঝুরঝুর করে শিশিরের সঙ্গে।

এখন, তুমি আমায় ডাকছো—
কামনার অরণ্যের নিস্তব্ধতায়।
তারপর, বনমধ্যে অন্ধকারের শুরুতা,

আর রাত্রির অরণ্যে
কামনার তীক্ষ্ণ সাপের সকরুণ।
ক্রমেই ঘন অন্ধকারে রাঙা জ্বলে উঠ্‌ছে
তোমাকে ঘিরে কামনার উৎসব।
হঠাৎ দেখ্‌তে পাই
তাদের সমারোহ চলেছে।—
সাম্‌নের রাস্তা থেকে আস্‌ছে আলোর রেখা
সন্ধানী চোখের মতো,
তুমি বন থেকে বেরিয়ে পড়্‌লে,
তোমার চুলের দুরন্ত গন্ধ
এখনো আমাকে মাতাল করে রেখেছে।
এলোমেলো হাওয়া দিকে চারদিকে
মহুয়ার দুরন্ত গন্ধকেও সে হার মানিয়েছে।

মনুমেন্ট

সুশীলকুমার ঘোষ

কত অশ্রুত অক্ষর প্রকাশিত ইতিহাস,
সুন্দর বন্ধুর রক্ত আর রক্তের মত লাল সিন্দুর
ভাঙা শাঁখার উলুধ্বনি আর
পুঞ্জীকৃত জমাট চোখের জল—এই মনুমেন্ট।

রাজার রাজসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে
কত সৈনিক নিঃশেষ করেছে জীবনাস্ত
তাদের আত্মার বাক্যহীন সান্ত্বনা এই মনুমেন্ট্।

মাটি যারা পায়নি, এক শিল্পির মাটি হতে যারা চায়নি,
কোন অজ্ঞাত কোণে ফেলেছে যারা যন্ত্রণাকাতর শেষ নিঃশ্বাস,
তাদের সম্মিলিত একটি কবর-এই মনুমেন্ট।

এই ইট-কাঠ-পাথর সিমেন্টে,
চাপা দেয়া আছে কত শতাব্দীর টুকরো, কত ব্লেট
সোনাগুলি বিদ্বান্ত গ্যাস আরো কত কী
—এক কথায়, মহাযুদ্ধের কলঙ্কিত ইতিহাস
তার কালির পসরা মাথায় ক'রে আছে
গর্বোদ্ধত উন্নত এই মনুমেন্ট।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

আমি এর পাশে দাঁড়িয়ে শুনতে পাই
সঙ্গীনাহত সৈনিকের মৃত্যুযন্ত্রণা—
—যার নিঃশব্দ প্রেত এই মনুমেন্ট্—
আধমন ওজনের জামাকাপড়ের তলায়
যার উষ্ণরক্তস্রোত ক্রমে হয়ে আসছে শীতল তুষার,
পিঠে যার বাঁধা আছে জলের 'ফ্লাস্ক্'
কিন্তু সামর্থ্য যার নেই হাত বাড়িয়ে তা থেকে জল নেবার,
চোখে যার অন্তিমকালে ভেসে উঠছে
নিরাকার ঈশ্বরের কল্পিত রূপ নয়
—যে ঈশ্বর তার মৃত্যুকালে ঠোঁটে জল তুলে দেয় না—
তার লোলুপ চোখে প্রতিচ্ছবিত হচ্ছে
প্রিয়ার সেবানিপুণ রূপ,
প্রিয়ার বিদায়কালীন শেষ চুম্বন।

জীবনযুদ্ধে অকৃতী সৈনিক আমরা—
আমরাও আমাদের অকৃতজ্ঞতা,
সৈনিক মৈত্রের ইতিহাস,
ঋণ আর অকৃতকার্যতার তাগাদা
লিখে রেখে যাব—
—আমাদের পরবর্তী পুত্রপুরুষের মনুমেন্ট।

সূর্য্যমুখী

বিজেন্দ্র মৈত্র

আজ তো মেঘে আকাশ ঢাকা,
কার দিকে মুখ তুলে ধরবে তুমি সূর্য্যমুখী ?
মাটির রসে পূর্ণ হ'ল দেহ
পাপড়িগুলো খুলে গেল ধীরে ধীরে।

ঊর্দ্ধমুখী হয়ে চেয়ে রইলে পূর্বদিগন্তে
সে মুখ চলে পড়লো পশ্চিমের দিকে
তবুও সূর্য্যস্নানে শুচি হ'ল না দেহ
মাঝে মাঝে তৃষ্ণায় বুকের ভিতর উঠছে ঝরঝরিয়ে কেঁপে।

অপলকে চেয়ে রইলে পশ্চিম আকাশে,
যদি কখনো স্নিগ্ধ মেঘের ফাঁক হ'তে
তোমার বুকের পরে এসে পড়ে শেষ রশ্মির হাসিখানা
সমস্ত দিনের প্রতীক্ষা সার্থক হবে, এই কামনা।

বাঁশী

বিজেন্দ্র মৈত্র

কুয়াশা জড়ানো শেষরাতে, শুক্লা ত্রয়োদশীর
নিভে আসা চাঁদের পাণ্ডুর হাসি যখন ছড়িয়ে আছে,
এমন সময় বেজে উঠলো বাঁশী, কলের বাঁশী
ঘুমন্ত শহরের শেষ প্রান্তে, শুক্লকীর মিলে।

আচমকা ঘুম ভেঙে বুকের ভিতর কেঁপে উঠলো।
প্রত্যহ এমনিই বাজে, কুলীদের ঘুম ভাঙানো বাঁশী।
নিশীথ নগরীর প্রশান্তিকে ছিন্নভিন্ন ক'রে
রক্তাক্ত নখরে বিদীর্ণ ক'রে বেজে চলেছে বাঁশী।

এমনি ক'রেই কলের বাঁশী রোজ বেজে ওঠে
প্রত্যূষের সূচনায়। কুলিরা জেগে ওঠে।
না—না—পারলুম না। নিষ্ঠুর বাঁশী, তুমি থামো
তোমায় ঘুমভাঙানো, তীক্ষ্ণ, শাণিত সুর থামাও।

এ তো বাঁশী নয়, যেন জলন্ত গলিত আগুনের স্রোত
কানের মধ্যে দিয়ে আত্মায় প্রবেশ করছে
দগ্ধ করছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে সমস্ত শরীরকে,
অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত শরীর নীল হয়ে আসছে।

আমার শেষরাতের স্বপ্নকে তুমি বিষাক্ত কোরো না
এখনো তো সূর্য ওঠেনি, একটু ঘুমোতে যাও।
তোমার নিষ্ঠুর সুরে আত্মাকে আর নির্যাতন কোরো না
রাতের গভীরে তাকে একটু বিশ্রাম দাও।

পূব আকাশে শান্ত বিবর্ণতা ফুটে উঠ্‌ছে ধীরে ধীরে
এখনই জেগে উঠ্‌বে সহর উন্মাদ কোলাহলে।
নিষ্ঠুর বাঁশী! তুমি থামো, থামো, করুণা করো
তোমার ও ঘুমভাঙানো পৈশাচিক সুর থামাও।

প্রার্থনা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর শৈশবক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।
যেন পূর্ব্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি, ক্রীত, সমানত,
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মধুকের ফুলে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।
কর্মঠবৃত্তির অহঙ্কারে
ঢাকো অশক্তমূঢ়তা। তাদের দৃষ্টান্ত-অনুসারে
আমিও ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করি।
মর্য্যাদায় ছিন্নিত পাগড়ি
জোড়ে যেন বারম্বার তুষে আত্মপ্রসাদের মোতে।
রৌদ্র জ্যোতি হতে
আবার ফিরাও মোরে অমলার প্রেম বাহুভাগে।

মূলধন্ত্র হাতে যেন লাগে
উদ্ধপুষ্ট ঘোটকের তৈলসিক্ত বেগ ;
মনে যেন উদ্ধত্বনে অপঘাত হৃদয়ের খেদ ॥

পিতৃপিতামহদের প্রায়
তোমার নামের গুণে তীর্থ হয়ে যশঃ গাই
মূঢ়, মূক গতজ্ঞলোকে দিই যেন বলি
রক্তপিপাসিত যূপে।
যাচাল বিদ্রূপে
হুঙ্কারিলে দুর্বৃত্তের উদ্ধত দম্ভোলি,
গুরুজনদের মতো করি যেন শাষ্টাঙ্গ প্রণাম
শক্তির উচ্ছল পায়ে ; আত্তির সংক্রাম
কেটে গেলে কালক্রমে জনাকীর্ণ রাজপথ থেকে,
স্ফীত বুকে অপ্রতিষ্ঠ পৌরুষের বেগে,
হাসিমুখে হাত নেড়ে
পলাতক সহযাত্রীরে ডেকে,
প্রমাণিতে পারি যেন সবি তব ইচ্ছা, ইচ্ছাময় ॥

এলে পরে লাভের সময়,
স্বয়ংনির্বিচারে, সকলি তোমার দান ব'লে,

নিত্যের যেযাক কড়ি হাতারে কৌশলে
আমিও জমাই যেন যক্ষসংরক্ষিত কোষাগারে।
প্রতিধ্বনি মাতামাতায় উক্তির উদারে
দূকারে ইন্দ্রিয়াসক্তি ; অবিযুক্ত অন্নের আহারে
বিষাদে সঙ্কীর্ণ লোভ ; জলে, স্থলে, নভে
বিরোধের বীজ বুনে ; নিরন্তর নিষ্কাম প্রসবে
ভারাক্রান্ত গর্ভিণীর স্থির অন্তকালে
তোমার প্রতিভূ নেমে উত্তরিব স্বর্গের আশ্বাসে
সাধ্বীর সদ্‌গতি যেন করি।
উর্দ্ধশ্বাস উৎসবের উদাসী উল্লাসে
তোমারে পাশরি,
দারুণ দুর্দ্দিনে যেন পূজা মেনে বিস্ময়ে শুধাই,
"স্মরণে কি নাই,
"হরাময়, আহিতের স্মরণে কি নাই ?"

ভগবান, ভগবান,
অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান,

অতিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ
আমার স্বতন্ত্র সূত্রে তবো ভূমি আমার বিরাজ।
শতাব্দির কুরুক্ষেত্রে
সমস্তাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ও'নে
সূত্রোগ্রথেদিনীলোভী মুহূর্তস্তরে কবিতে দেখাও
অপরের অপঘাত। তুলে নাও,
আমার ছত্রাশ্বরজ্জু, হে সারথি, তুলে নাও হাতে।
স্বার্থের সংঘাতে
বিতর্ক, বিচার হানো। মর্মে মর্মে, মজ্জায় মজ্জায়
জাগাও অস্ত্রায়, শাঠ্য। হিংস্র অলজ্জায়
পুণ্যশ্লোক সগোত্রের তুল্য মূল্য দাও দাও মোরে।
অপ্রকট সভ্যতার জোরে
আমার অন্তিম যাত্রা অতিক্রমি সুমেরুর বাধা
হয় যেন নন্দনে সমাধা,
যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা
সুকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেলে অমৃত ধরিয়া,
নীবীবন্ধ খুলে,
ওরে আছে অমাবিষ্ট বহুতরখুলে।

কিন্তু যেথা সর্পিল নিষেধ
কম্পুষ্কের উপজীব্যে সাধে আত্মবেধ
প্রমিতির বিষবৃক্ষে, অমিতির অচিন্ত্য অভ্যাবে ;
অন্তরঙ্গ জনতার নিবিড় সদ্ভাবে
হয়নি যাসোপযোগী অভ্যাবধি যে-নিস্তাপ ঘর ;
পশুপতি বাজারে ডমরু
ঘোর সোডিপতিদের নাচায়নি যার ত্রিসীমায় ;
নিরালম্ব নিরালোকে যেথা
মেঘবিজপ্রবর্ষিত ত্রিশঙ্কু ত্রিমায়,
যৌনের মন্ত্রণা শোনে মৃত্যুবিপ্রলব্ধ নচিকেতা ;
সেখানে আমার ঘরে বিছায়ো না অনন্ত শয়ান,
হে ঈশান,
সূত্রবদ্ধ মুদ্রীনের কল্পিত ঈশান ॥

অনন্ত

ছায়া দেবী

যেদিন তোমায় দেখেছিলাম,
মধুময় দিন ছিলো জীবনে।

সকালের মেঘ-ভাঙা
স্পর্শ-কোমল বর্ষার আলো
উদ্ভাসিত করেছিলো
তোমার মুখটি,
প্রতিভাসিত হয়েছিলো
সে আধো-আলো-আঁধারের মায়া
আমার মনের নিবিড় পরতে।

অগণন কতদিন
তবু তো মলিন হলো না—
সেই মেদুর আলো,
মনের মধুবনে তোলা আছে এখনো
সোনালী আখরে লেখা

স্মরণের গন্ধ তারাতুর
তৃষ্ণাপত্রখানি।

এখন তুমি কতদূরে!
থাকবে কি শুধু পুঁথির পুঁজি?
উতল মনের বিরল তন্ত্রতায়
মর্মরিয়ে উঠবে সেই বিজন স্মৃতি?

শিকারী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

ঘুমে ঢেকি পাহাড়ের শিবিরে
উদ্যত নখরের বিষ,
শার্দূল-পুঙ্গের পীত বিদ্যুৎ
লেলিহান ঘাসের চূড়ায়।
ওক্ আর পাইনের গায়ে অস্থানো
ঠাণ্ডা পাইথনের ধড়ি।

পাহাড়ীরা বাসা থেকে
ছুঁড়ে দেয় আকাশের হাতে
ধোঁয়া আর আগুনের হল্কা।
জানি না কি প্রতিশোধ নেবে
তারা এই মাংসাশী সভ্যতায়।
ঘন ঘন মাদলের শব্দে
রক্ত-পিপাসু বাদুড়েরা
অন্ধকারের ডানা নাড়ে।
ধনুর্ধর ভারী ছায়াদের
দেয় ডাক প্রেতলোক থেকে।

হে সাইকেলধারী !
সাঁইত্রিশ সনের, হে
কোটালকুমার,
জীবনের দুরাশাকে
সন্ধ্যার দুইপাখে
মিলে ছড়িয়ে,—
দুর্বার গতির আবেগ,—
ধাবমান ট্যাক্সির বেগে,
ঝনিরামী মোটরের যাত্রী,
টগলেট পাউডারগন্ধী,
মরীচিকা-মুখের, মুখর
চকিত হাসির মোহে,
হিমালয় অভিযানে ক্লান্তি,—
হে কোটাল-পুত্র,
নির্বাপিত শেষ প্রহরের
ক্লান্ত নাগরিক—
মরা ছুটো হরিণ শাবক
আর, পাথরের মত সব,
গুলিবিদ্ধ পাখীদের,

ঝড়্‌পেয়ো পদ্ম প্রাণ
তোলাবে তোমায়,
থামাবে কি হত্যার বেগ
ঘণাযুত পাশবিক মুষ্টির শিরায় ?

নগর মিলেছে তাই ধুঁয়ে,
রক্তলিপ্ত হস্তে,
আগ্নেয়গিরির মত।
তাই ত আমার পথ
বিশাল বক্ষের,
ওধু আর পাইনের নীচে,
শ্যাওলোতে আর মরা পাতার বুকে।
মাথার উপরে ঘুমগভীর,
মাকড়সা জালে ভরা
শাখা প্রশাখায়,
কেবিন সমুদ্রের ফাঁকে,
ছোট ছোট আকাশের
নীল দ্বীপ টানে অহরহ,
সাথির মত,
কোন অন্ধ পতনের দিকে।

কাল দেখি সন্ধ্যার আলোতে,
ছুতে-পাওয়া নীল প্রজাপতি,
বসেছে বন্দুকের ঠোঁটে,
মৃত্যুর মধু তাকে টানে।
আর দেখি মনে পড়ে বুনো সন্ধ্যায়,
রক্তাক্ত হরিণ শাবক।
নরম ফলের মত,
তার দুটো চোখের মণির
ধারালো প্রশ্নের স্বর,
পাতালের বুক ফুঁড়ে আকাশেতে ঠেকে।

তাই আজ অন্ধকারে
নীল প্রজাপতি ওড়ে
ঘুরে ঘুরে মাথার ভিতর,
রক্তমাখা হরিণের চোখ দুটো জ্বলে,
অগ্নিকুণ্ডে কাঁদে হত চোখ।
পশুদের মাংসপিণ্ড পোড়ে,
আগুনের বিসর্পিল লেখা
ফিরে রাখে বুনোদের মুখ।
অদ্ভুত, কালো, সরীসৃপ,
বুকের ধূসর ঘন শীত
গুলে দেয় রাতের বাতাসে।

চৈত্র-চুর্ণি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

যখন অন্ধকারের উপর পা ফেলে ফেলে
তোমার কথাগুলি আসে,
অমাবস্যার রাত্রে
স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দেওয়া
ছোট ছোট জেলেডিঙির মত,
তখন আমি প্রসাধনের ভিড়ে
ভড়ো করছি,
নতুন নাগরের বৈদ্যুতিক ইশারা,
যখন অন্ধকারের পিঠে ভর করে
তোমার শাপগুলো আসে।

বৃহন্নারদীয় পড়েছি।
প্রজাপতির দ্বিতীয় পেখম ফুটে।
প্রজাদের ফুটলো,
কালো পর্দার আড়াল
আকাশ থেকে মাটিতে।
তার দুই পাশে,
আত্মরেখা আর আত্মহত্যার স্রোত,

আমি আর তুমি,
সাম্যবাদ আর ব্রতচারী নৃত্য,
দিবানিদ্রা আর নৈশভ্রমণ—।
তবু বৃহদারণ্যক পড়ছি,
আর কালো কালো,
পর্দানেরা মুখগুলি
তুহাতে ঠেলে ঠেলে,
পথ করছি।

উৎসবের কুয়াশা ত শেষ হল।
এখন পড়লো শীত।
সাধারণ ও মাধ্যমিক হবার শীত।
বাপানী ট্রেন উপরে,
ছাগলের তুত-তাড়ানো মুখ,
বিজন দেয়ালগুলোর
ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেলে।
এখন, কর্কশ কবল খড়িয়ে,
নিতন্ত তুকটের ছাইগুলো
ধুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিই,—
অতগুলো মার্বেল পাথরের মত

চক্ষুষ্মান,
অন্ধবধির,
বিশ্বাসঘাতক
মুখের ছাই।

হে বিহারিণী কাব্যের কবি,
তোমার হাজার হর্ষ পাণ্ডুরের
তলার নীচে,
এ ভয় যেন থাকে,
পৃথিবীর আবহাওয়া
তোমার টানছে
অজস্র অপমৃত্যু দিয়ে ;
তোমার রেশমের মত নরম
জাপানী চোখের ওপার দেখনে
আন্তর্জাতিক সৈন্যদলের সঙীন্—।
অনেকেই ইতিমধ্যে
মেরে গড়েছেন,
উটপাখীর পদাতিক দলে।
কিন্তু এটা ভুলো না,
মানুষগুলো নিতান্তই মানুষ,
হে বিহারিণী কাব্যের কবি।

অধ্যাত্ত আয়ক

সমর সেন

ঘাসের সামনে তিমিরিয়া ভিড় করে,
হাওয়ায় মেঘের শব্দ
আর বৈশাখের বৃষ্টিতে ভেজা অপরূপ সহর।
মোটরের সীটে রেখে শনিবারের বিলাস,
ছুটির আকস্মিক শব্দে
চকিতে জোগে অমর আত্মার গাম্ভীর্য,
মুহূর্তে মুখর রাস্তা পারাপার করে।
রসিদ সামাদের কথা অমৃত সমান,
পরস্ত্রীকাতর চোখ মেলে অস্পষ্ট মেঘে
মাঠের অন্ধকারে প্রেমিক ফিরিঙ্গির ভিড়,
আর ব্যর্থতার বিরস দিনগুলি কাটে।

গম্ভীর শব্দে সহরের উপরে আকাশ কাঁপে,
নীচে বিবর্ণ বস্তি,
আর ছদ্মবেশ ঘাসের মাঠ।
বৃষ্টির শেষে বিষণ্ণ শান্ত ইন্দ্রধনু,
তবু বারে বারে মনে হয়—
এখানে হাওয়া নেই,
মাটির উপরে গ্রীষ্মের পাতাগুলি কঠিন পাথর।

এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে

বুদ্ধদেব বসু

এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে, এই পৃথিবীর।
একদিকে আমি, অন্যদিকে তোমার চোখ শুদ্ধ, নিবিড়;
মাঝখানে আঁকাবাঁকা ঘোর-লাগা রাস্তা এই পৃথিবীর।

আর এই পৃথিবীর মানুষ তাদের হাত বাড়িয়ে
লাল রেখা আঁকতে চায়, তোমার থেকে আমাকে ছাড়িয়ে
জীবন্ত, বিষাক্ত সাপের মত তাদের হাত বাড়িয়ে।

আমার চোখের সামনে স্বর্গের স্বপ্নের মত দোলে
তোমার দুই বুক, কল্পনার প্রতিমার মত খোলে
তোমার চুল আমার বুকের উপর, ঝড়ের পাখির মত দোলে

আমার হৃৎপিণ্ড; আমরা তবু করবো কা'কে?
আমরা তো জানি কী আছে এই রাস্তার এর পরের বাঁকে—
সে তো তুমি—তুমি আর আমি, আর কা'কে

আমরা দেখতে পাবো ? আমার চোখে তোমার দুই বুক
স্বর্গের স্বপ্নের মতো ; তোমার বুকের উপর উত্তপ্ত, উৎসুক
আমার হাতের স্পর্শ ; ফুল ছাপিয়ে ওঠে তোমার দুই বুক

আমার হাতের স্পর্শে, যেন কোনো অন্ধ অদৃশ্য নদীর
আবর্তে ; তার মধ্যে এই সমস্ত দুরন্ত পৃথিবীর
চিহ্ন মুছে যায় ; শুধু এই বিশাল অন্ধকার নদীর

তীব্র আবর্ত, যেখানে আমরা নেই, আমরা এক, আমি
আর তুমি—কী মধুর, কী অনন্তপ-মধুর এই কথা—
তুমি—তুমি আর আমি।

নবযৌবনের কবিতা

মানুষের জীবনে নবযৌবন স্বভাবতই বিদ্রোহের বস্তু। এত বড় পণ্ডিত কোনো মানুষই বোধ হয় নেই যার জীবনে ষোলো থেকে ছুব্বি বছরের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যেও কোনো মহৎ প্রেরণা কি ভাবনা আসেনি। আমাদের মেসের সেলনওয়ালা বৈষয়িক বুদ্ধদের দেখে এ-কথা মনে আনা শক্ত, কিন্তু খুব সম্ভবত ঐ ইন্‌ভেস্টমেণ্টের বস্তাগুলোও বয়ঃসন্ধিকালে একবার কোনো ভাবের আগুনে জ্বলে উঠেছিলেন। সাধারণ মানুষের সম্বন্ধেই যখন এই কথা, তখন কবিপ্রকৃতিতে নবযৌবন যে হবে আগুনের বন্যার মত সেটা আশাই করা যায়। সাধারণ মানুষের জীবনে সেই ক্ষণিক ও দুর্বল স্ফুলিঙ্গ এক ফুঁয়েই নিবে যায়, তারপর ফুঁড়ি দেখা দেয়, শরীরের মেদ আর ব্যাঙ্কের খাতা এক-যোগে স্ফীত হ'য়ে উঠতে থাকে। নয়তো নানা সংগ্রামে আঘাতে বিক্ষোভে হতভাগ্য জীবনসৈনিক কোথায় যে তলিয়ে যায় তার চিহ্নই থাকে না। আর কবির উদ্দাম নবযৌবনের বিদ্রোহ ক্রমে মিটিয়ে দেয় যাকে, হ'য়ে আসে গভীর ও গম্ভীর; হয়তো প'ড়ে ওঠে শান্তি সকল বিরোধ বিক্ষোভ ছাপিয়ে, হয়তো পড়ে কোনো নবনির্মাণের ছায়া। যে-কবির দীর্ঘকাল বাঁচবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর প্রথম ও শেষ বয়েসের রচনা পাশাপাশি পড়লে এইটেই আমরা দেখতে পাই।

এই বিদ্রোহের রূপ বিভিন্ন কবিতে বিভিন্ন পথ নেয়, কিন্তু মোটের উপর কতগুলো লক্ষণ প্রায় সমান থাকে। পারিপার্শ্বিক জীবনে ও সমাজে যা-কিছু অনুদার ও অশুভ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর, তার বিরুদ্ধে: নিজের মধ্যে যত জটিলতা ও বিরোধ, তার বিরুদ্ধে: ধর্মের, সমাজের ও সাহিত্যের অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে: আর সেই সঙ্গে প্রচলিত কাব্যরীতি ভেঙে-চুরে নতুন রূপ ও রীতি-রচনা—কবিবিশেষের প্রথম বিদ্রোহ-বন্যার গতি দেখা যায় এ-সব দিকে। কিছু হয়তো থাকে আতিশয্য, কিছু হয়তো ফেনা, কিন্তু প্রেরণা

যেখানে সত্যিকারের, যেখানে বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টি নিজস্ব রীতির সঙ্গে সংযুক্ত, সেখানে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি, স্বীকৃত ক'রে তুলি ছই।

সমর সেনের কবিতায় ('কয়েকটি কবিতা' : কবিতা ভবন : পাঁচসিকা) এই বিদ্রোহের ভাব ও ভঙ্গি স্পষ্ট। প্রথমে রীতির কথা বলি। তাঁর কবিতা গদ্যে, এবং কেবলই গদ্যে। আমার ধারণা ছিলো, গদ্যরচনায় তালো। যখন থাকলে তবেই গদ্যকবিতার আহ্বান আসে, কিন্তু সমর সেনের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখলুম। তিনি পদ্য ছাড়া লেখেননি, এবং কখনো লিখবেন এখন আশাও আমার নেই। এখানে এটা বিশেষ ক'রে উল্লেখ করবার যে তাঁর গদ্য ছন্দ বাঙলা ভাষায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নতুন বস্তু। রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কোনো কবির গদ্যছন্দের সঙ্গে তার কিছুমাত্র সংস্রব নেই। আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলি। অর্থাৎ এটা আমরা ধ'রেই নিই যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আধুনিক বাঙালি কবির প্রচেষ্টার প্রথমটায় অন্তত অনিবার্য। কিন্তু এই যুবক-কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কখনোই পড়েননি, সেটা আমার আশ্চর্য লাগে। 'কয়েকটি কবিতা'য় রবীন্দ্র-কাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন পংক্তি প্রায়ই উদ্ধৃত হয়েছে ; কিন্তু তার পিছনে আছে বিদ্রূপের সুর। কথাটা আশা করি কেউ ভুল বুঝবেন না। বিদ্রূপটা রবীন্দ্রনাথকে নয় ; যে-প্রণালি ও বিশ্বাস, যে-তপোবনসুলভ মনোভাব রবীন্দ্র-কাব্যকে গঠন করেছে, বিদ্রূপটা তার উদ্দেশে। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে', কি 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' রবীন্দ্র-কাব্যে এই হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো বিদ্রোহ-বাণী। সেই সময়ে ও-কথা বলতে পারাতেই ছিলো কবির দুঃসাহস ও প্রতিভা, কিন্তু তার পরে আরো অনেক বছর তো কেটে গেছে ; এখনকার জীবন নতুন ও ভিন্ন সমস্যা নিয়ে কবির উন্মুখ চিত্তকে মথিত করছে। বাঙলা কবিতায় যে সত্যাসুন্দরের ঐতিহ্য এতদিন চ'লে এসেছে তার মধ্যে এই নতুন কবি কোনো অবলম্বন খুঁজে পাননি ; গোড়াতে, অন্তত, সেই ঐতিহ্যের বিরুদ্ধেই তাঁকে বিদ্রোহ করতে হয়েছে। সেইজন্যই মন-মন উক্তি ও বক্রোক্তি।

এই ঐতিহ্যটা কী ? আমি নিজেও সেই ঐতিহ্যেরই অন্তর্গত। মোটামুটি তার গতিটা বুঝতে পারি। সৌন্দর্যের অনুভব ও প্রকাশ, কবিতা বলতে তো আমরা এই বুঝেছি। এর পটভূমিকায় আছে সেদি

কীট্‌স্, ব্রাউনিঙ টেনিসন, তা ছাড়া উপনিষৎ আর বৈষ্ণব কাব্য। সৌন্দর্যের উপভোগে ও উপলব্ধিতে নিজের ভিতরে যত বাধা, যত মানসিক প্রলোভন ও দুর্বলতা তার বিরুদ্ধে আক্রোশ ও বিদ্রোহ; একদিকে মহৎ ও গোরবময় প্রেরণা, অন্যদিকে লঘিল ও ক্ষুদ্র কামনা—এই আত্মবিরোধের তীব্র যন্ত্রণা ও সেই দ্বন্দ্বের প্রবল উপর অভিসম্পাত। আমি যে 'বন্দীর বন্দনা' লিখেছিলুম তার মূল কথাটা ছিলো এই।

নিজের কথা উল্লেখ করতে হ'লো: পাঠক মার্জনা করবেন। যে-রকম বয়েসে সমর সেন এই কবিতাগুলো লিখেছেন, সেইরকম বয়েসেই আমি 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলি লিখেছিলুম; এই দুই নবযৌবনের ভাব মনে-মনে তুলনা করতে ভালো লেগেছিলো। ইতিমধ্যে আট-দশ বছর কেটে গেছে। দেশের হাওয়া আরো কিছু বদলেছে; তুলনায় এইটেই দেখা গেলো যে 'কয়েকটি কবিতা' অনেক বেশি 'আধুনিক'। 'বন্দীর বন্দনা'র বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, 'কয়েকটি কবিতা'র বিদ্রোহের উৎস সামাজিক বিরোধ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ। নিজের মুক্তির জন্য সমর সেন ব্যস্ত নন, বিধাতাকে অভিশাপ দেবার জন্যও কখনো তাঁর কাব্যে টেনে আনেননি। সৌন্দর্যের উপলব্ধির পথে যে-বাধা সেটা তাঁর পক্ষে আত্মবিরোধ মোটেও নয়; সেটা বৃহৎ সমাজ-স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধ। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' :—কবি মনের কথাই তো এ-ই। অপরূপ এই পৃথিবী। কিন্তু সমর সেনের আধুনিক দৃষ্টিতে এই সৌন্দর্য আদৌ কি অক্ষুণ্ণ নয়। ধনিকের লোভ তাকে মেরেছে, তাকে নষ্ট করেছে রোগ ও দুর্ভিক্ষ, তাকে লঘিল করেছে যুদ্ধ, নির্বোধ মধ্যবিত্ততা, তাকে বিকৃত করেছে আধুনিক নগর-জীবনের বণিক-শক্তির ব্যভিচারী প্রতাপ আর তারই সঙ্গে হাত-ধরে-করা দারিদ্র্যের নির্লজ্জ শ্রেণি,—এক অন্ধ, অনিপুণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমান মানবজীবনের তারসাম্য গেছে উল্টে। এখানে সৌন্দর্য আসবে কেমন ক'রে?

উর্বশী

১ তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরে
দিগন্তে ধূসর মেঘের মতো।

কিম্বা আমাদের গ্লান জীবনে ঘুমি কি আসবে
যে ক্লান্ত উর্বশী,
চিরন্তন সেবাসদনে যেমন বিরহ মুখে
ঊর্মির মেয়েরা আসে ;
অতো অমৃত রাত্রির ঘুমির ক্লান্তি
তাতো দীর্ঘশ্বাস,
অতো সমুদ্র সকাল তিক্ত নাম্রির মতো,
আর অতো ঝিনু ;

উপরে যা বলেছি, হয়তো একটু কাঁচা শোনাতে পারে। আমার (কি, আশা করি, সময় দেবেন) বলবার কথা কখনোই এ নয় যে মানবসমাজ আজ এই অর্থনৈতিক দুর্ব্যবস্থায় নিষ্পেষিত ব'লে কবি তাঁর নিজস্ব ভাবমণ্ডলে সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন না। সমস্তই নির্ভর করে কবির দৃষ্টিভঙ্গির উপর। মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী যারা বৃহৎ সমাজের শোষণ এ-পর্য্যন্ত পৃথিবীতে চিরকালই চ'লে এসেছে ; মধ্যযুগে হয়তো তার রূপ আরো ভয়াবহ ছিলো। কিন্তু প্রায় সকলযুগেই এমন কবি দেখা দিয়েছেন, যিনি জীবনের সমগ্র ও চিরন্তন মূল্যকে দেখেছেন। স্থানীয় ও সাময়িক ঘটনায় আবদ্ধ হ'য়ে থাকেননি। তাহ'লেও এটা সত্য যে কবিও তাঁর যুগেরই সৃষ্টি ; সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, তা ছাড়া কবির নিজের ব্যক্তিগত জীবন, অচেতনভাবেই তাঁর কাব্যের রক্তমাংসকে গ'ড়ে তোলে। এ তো খুব সোজা কথা যে গ্রীক এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডের শক্তি ও সমৃদ্ধি আছে তখনকার কবি-নাট্যকারদের স্ফূর্তি-উচ্ছ্বাস ও বলশালী বেপরোয়া সৌন্দর্যের মূলে ; উনবিংশ শতকে যন্ত্রের বহুল প্রচলন ও বিরাট সাম্রাজ্যস্থাপনের ফলে ইংলণ্ডের ধনোৎপাদন ও প্রজাসংখ্যা প্রচণ্ড বেগে বাড়ানো সম্ভব হয়েছিলো ব'লেই ভিক্টোরীয় কবিদের মধ্যে দেখতে পাই জীবনের কতগুলো মূলসূত্রে এমন দৃঢ়ীভূত প্রগাঢ় বিশ্বাস। ইংরিজি সাহিত্যে যুদ্ধের পরে কিছুকাল দেখলুম অন্ধ-হতাশের যুগ। নির্মোহ, শূন্য অবিশ্বাস ; তার যথেষ্ট কারণ ছিলো। আবার, অন্তের প্রকৃতি অতি-আধুনিকদের কাব্যে লেগেছে নতুন সুর : বর্তমান সময়ে পড়পড়তা মানুষের জীবনের মৃতপ্রায়তা, দীনতা ও গ্লানি সম্পূর্ণ উপলব্ধি ক'রেও তাঁরা

হতাশ নয়। তাদের মধ্যে আছে আশা, আছে নতুন ও সুন্দর পৃথিবী-রচনার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা। তারও কারণ আছে।

২

বাঙলাদেশের বিংশ শতাব্দীর এই তৃতীয় দশকে যে-কবির যৌবনের উন্মেষ হ'লো, কতগুলো জিনিসের প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। সে দেখবে তার চারদিকে মধ্যবিত্ততার ঠাসা দেয়াল; তার যৌবনের উদ্দামতা যেদিক দিয়ে বেরোতে চাইবে সেদিকেই যা যাবে। ভালো পাশ করবে, সম্ভব হ'লে আই-সি-এস্-এ ঢুকবে, নয়তো অন্য কোনো বড়ো চাকরি বাগিয়ে আদেলাদ্যোর উজ্জ্বল ঘনি হ'য়ে রাধাবাহাদুরি গোধূলিতে জীবনের অবসান করবে, তার পরিবারের ও সমাজের এ-ই তো উচ্চমত আদর্শ। তার পারিপার্শ্বিক একেবারে বেখাপ্পা, এমনকি প্রতিকূল, তার মনের আগের উদ্দীপনাকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট। সহরে সে দেখবে বৈশ্য আদর্শের একচ্ছত্র আধিপত্য; অর্থসঞ্চীতির কোনো উপায়টি অন্যায় নয়, প্রত্যেকেই নিজ-নিজ স্বার্থের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে ব্যস্ত; ছোট-ছোট গণ্ডির রক্ষিত স্বার্থের খাতিরে বহুর লৌকিক ও আত্মিক বিনাশ। আর দেখবে বড়ো-বড়ো নীতিকথার আড়ালে লাম্পট্য ও স্বৈরাচার, যৌন বাসনার বিকৃতি ও অবমাননা, নিরানন্দ বাস্তিক কামের নিষ্পেষণ আর নিরানন্দ ক্রীত সম্ভোগের ক্লান্তি। কোনোখানে কোনো বড়ো আদর্শ নেই, নেই মানুষের দেহ-মনের সহজ স্ফূর্তি। সমস্তটা জীবন যেন এক কঠিন নিষ্ঠুর সিস্টেমের অন্তর্নিহিত ক্রীতদাস। স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ও তা থেকে মুক্ত নয়।

একটি মেয়ে

খামারের ভিজিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হোলো :
ঘাসের মতো চোখ, সুন্দর, তন্ত্র মুখ,
বন্যার ঠোঁট যেন নদীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে ভাসবার নিস্তীক আভাস ;

আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল ভীরু হৃদয়ে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

এই সামাজিক পরিবেশে কবির উন্মীলিয়মান যৌবন পীড়িত হবেই, এবং সেই পীড়া থেকে তার কাব্য হয়তো একেবারে মুক্ত হবে না। সমর সেনের কবিতায় এই অনুভূতিবোধ খুব বড়ো একটা জিনিস। নাগরিক জীবন আমরা আরম্ভ করেছি অনেকদিন; কিন্তু আমাদের কাব্যে এ-পর্যন্ত বেশির ভাগই পাওয়া গেছে রাখাল-বালকের চোখে পল্লীপ্রকৃতির ছবি। নগরের জীবন ও প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড ছবি কি উল্লেখ কোনো-কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও, এতখানি সমগ্রভাবে আধুনিক নগর-জীবন সমর সেনের কবিতাতেই প্রথম ধরা পড়লো। সমর সেন সহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ঘৃণ্য ক্লান্তির কবি। ঠিক যেন সহরের মুখটি ধরা পড়েছে তাঁর ছন্দে।

মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলস্যবোধ মতো রাত্রি

• • •

আর কয়ো লাল সাড়ি আর নরম বুক, আর চৈত্রিকাটা মসৃণ মানুষ,
আর হাওয়ার মতো সোশ্যালিজমের গল্প,
হে মহানগরী!
যদি ফেব্রুয়ারির কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে মলয়মারুতে
—ফুল আর কলেজ ছোলো শেষ, ছাইভস্ম ইট জমলীন,
দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,
সন্ধ্যা নামলো:
মাঝে-মাঝে দমকা গাছের মরম অপরূপ শব্দ,
দিগন্তে অলস চাঁদ, চাঁপাফুলে ভিড়;
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে!
কলেজ আর কলের বাঁশি আর পণ্যেরিখা আর মলয়

বন্ধু আর দুশ্চিন্তা
দুয়ার দিয়ে অন্তরে পুরা:—

('মানসিক')

ঘাস হ'য়ে এলো কবরে
ইভনিং-টাইম-প্যারিসের গন্ধ—
হে সহর হে ধূসর সহর !
কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কলেজ যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে সহর হে ধূসর সহর !
মৃত লোকের চিতে যখন তুমি নাচো
দশ টাকার নোটে কবরে প্রভবের হে উর্বশী.
তখন শহীদ আর ছাড়িত উদ্যানে.
অমরের পুষ্পের খুঁজে চিত্ত আত্মহারা
সাহস বক্তধারা
আর দিগন্তে অনন্ত চাঁদ ওঠে
হে সহর হে ধূসর সহর।

('স্বর্গ হ'তে বিদায়')

এই কথাগুলোতে আছে সহরের উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের প্রতিধ্বনি ; আছে তিক্ততা, আছে বিতৃষ্ণা, আছে বিদ্রূপ : আছে বণিক-সভ্যতার চাপে নীরক্ত মানুষের হতাশা আর উন্মত্ততা আর ক্লান্তি : আর আছে দিগন্তে অনন্ত চাঁদের ইসারা—সেটা অপ্রাপ্য নয়।

৩

সমর সেনের রচনায় একটি সুতীব্র দুঃখের যৌবনকে আমি দেখলুম, তাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। বাঙলাদেশে আজ যেন যৌবনের বড়ো অভাব ; পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো যে-অভিশাপ—"practical young men"—তাদেরই সংখ্যা এদেশে আজকাল মনে হয় বেশি। জীবনের যে সময়টা অদম্য ও আজগুবি কল্পনায়, সে-সময়টাতেই যারা নিজের মূলধনের চুলচেরা হিসেব করতে

বলে, তাদের কবিত্বশক্তির কথা তাবলে আতঙ্কে শিহরিত হ'তে হয়। তালো পাশকরনেওয়ালা হ'লেই আই-সি-এস্ কি পারতপক্ষে বি-সি-এস্-এর চেষ্টা: তারপর ব্যবসাবাণিজ্য বিবাহ, মাছের বাজারের মতো দরদস্তুর ক'রে যতটা সম্ভব বেশি আদায়ের চেষ্টা—বৈশ্যমনোভাব আমাদের বিবাহকেও বিপাক করেছে। তারপর আস্তে-আস্তে দেরা পাশকরনেওয়ালারা যখন বড়ো চাকরিতে বিহিয়ে বসেন—এমন একটা সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর, বুদ্ধিহীন সম্প্রদায় তাঁরা গ'ড়ে তোলেন, যা হয় আমাদের জীবনের যে কোনোরকম বিকাশের অতি যত্ন বিরোধী শক্তি। আমাদের দেশে যেন যৌবনই নেই: আমরা বুড়ো হ'য়ে জন্মাই, যদিও সাধারণত বুড়ো না-হ'য়েই মরি।

এরই মধ্যে 'কয়েকটি কবিতা'র বিদ্রোহী নবযৌবনের দেখা পেলাম। প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ-বিদ্রোহ নিশ্চয়ই নতুন নয়; কিন্তু বাঙলা ভাষার কবিতায় স্পষ্ট ও তীব্র হ'য়ে এ-প্রতিবাদ এই প্রথম বাজলো। প্রথমদিকার কবিতাগুলো একটু যেন অস্পষ্ট; সেখানে ঠিক সুরটাই আমরা শুনি, কিন্তু সে-সুর বিশেষ কোনোখানে যেন নিয়ে যায় না। সুরে ধরা পড়েছে হঠাৎ মনের এক-একটা ঝোঁক, এবং সেই সুর একটা বিশেষ জিনিস। কেননা সে-সুর সময় দেশের নিজস্ব সৃষ্টি। বাঙলা গদ্যছন্দকে যে-রূপ তিনি দিয়েছেন, সেটা আর কারুই নয়; তিনি আবিষ্কার করেছেন এই ছন্দের অভিনব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। এ-গদ্য ঠিক গদ্য কি প্রবন্ধের গদ্যই নয়; এ একেবারেই আলাদা জিনিস, প'ড়ে মনে হয় এ যেন বিশেষভঙ্গিতে কবিতায় যাচ্ছেন। 'কয়েকটি কবিতা' বইখানা ছোটো, কবিতাগুলোও ছোটো-ছোটো, একটি ছাড়া প্রায় সমস্তই কয়েকটি লাইনে পর্যবসিত। কবিতার এই রূপটা এত নতুন যে প্রথমটায় আশ্চর্য লাগে। এবং এই ছোটো বইখানার মধ্যেই আছে মধুর কিন্তু স্পষ্ট পরিণতির আভাস। যেটা বলেছিলুম অস্পষ্টতা, সেটা কাব্যের রূপটাকে ধরতে আনবার চেষ্টার প্রাথমিক অবস্থা, তা ছাড়া কিছু নয়। অল্প পরেই দেখা যায়, ধরা পাকা হয়েছে, তখন দেখতে পাই ভিতরকার কথাটা ছন্দের লীলায় ফাঁকে-ফাঁকে চাপা আলোর মত বিচ্ছুরিত। শক্তিশালী তরুণ কবি প্রথম উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে যে-আতিশয্য ক'রে থাকেন—এবং যে-আতিশয্য অবশ্যই মার্জনীয়, এমন কি শ্রদ্ধেয়—অবাক হ'য়ে দেখছি

এই রচনাগুলিতে তার কিছুমাত্র আভাস নেই। প্রায় প্রথম থেকেই এই পরিণত আত্মপ্রত্যয়ের ভাব শক্তিশালী কবিতেও বিরল। সেটা আছে ব'লেই সময় সেনের প্রভাব আধিকের ও ভাবের উভয় দিক থেকেই নতুন উদ্যোগীদের মধ্যে তো খুবই বেশি, কখনো-কখনো প্রতিষ্ঠাবানে কবিতেও দেখা যাচ্ছে—যদিও তাঁর রচনা ছাপার অক্ষরে বেরুচ্ছে মোটে দু'বছর ধ'রে।

এ-কথাও বলবো যে সময় সেনের পরিণতির এটা প্রথম পরিচ্ছেদ মাত্র। আরো অনেক কিছু তাঁকে করতে হবে। 'কয়েকটি কবিতা'র রচনা-গুলো মোটামুটি এক ধরণের; অনেক কথায়, বিশেষণের ও উপমায় পুনরুক্তি দেখা যায়। সেটা অবশ্যই দূষ্য নয়। বিশেষ কতগুলি কথায় পুনরুক্তি স্বকীয় প্রতিভারই ফল। কিন্তু পরিবর্তন দরকার; পরিবর্তনের ভাঙাচোরাতেই তো পরিণতি ও নতুন গঠন। কোনো কবি হয়তো একটা কাব্যরূপ একবার পেয়ে যান—তারপর সেটারই মোহে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন, তারপর শুরু হয় নিজের অনুকরণ। এটা বড়ো শোচনীয়। বাঙলা কাব্যে এর চমৎকার উদাহরণ 'মরীচিকা'র যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। নিজের সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যেতে না-পারলে বড়ো কিছু করা যায় না। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। সময় সেনের এখন একটা মোড় নেবার সময় হয়েছে। যা তিনি এখন পর্যন্ত করেছেন, তা থেকে ছুটে বেরিয়ে তাঁকে যেতেই হবে। নয়া কবিতা তাঁকে লিখতে হবে; ছোটো-ছোটো রচনার নিজস্ব মূল্য যতটাই হোক, তাতে গঠনের ক্ষেত্র কম, এবং বড়ো কাব্যে গঠনশক্তি খুব একটা বড়ো জিনিস।

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘমণির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের ধূসরে ছায়া ফেলে
মেঘলোকের দীর্ঘ বহ্নি,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
মানুক মহুয়ার মদ।

('মহুয়ার দেশ')

কবিতা

মদনভস্মের প্রার্থনা

মাস্তলের দীর্ঘরেখা চিরন্তন,
তারাদের অদ্ভুত নাচন,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ মাঝিদের গান।
সমস্ত দিন কাটে দুঃস্বপ্নের মতো;
রাত্রে ঘুমের প্রেম: দুঃস্বপ্নের কারাগার।
কতো দিন, কতো সফর দীর্ঘ দিন,
কতো গোধূলি-মন্দির অন্ধকার,
কতো মধুমাখি বন্দরে গোলাঘর,
আজ ফুরালোকে দাও প্রাণ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ মাঝিদের গান।

—সমস্ত বই থেকে সব-চেয়ে-ভালো কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করলাম। গদ্যের ছন্দটা নিখুঁত; পর-পর কয়েকটা ছোটোলো রেখায় ফুটে উঠেছে গভীর ইঙ্গিতময় ছায়াছবি। আশা করি যে-মাঝিদের গান অচিন কানে এসে পৌঁচেছে, তার টান তাঁর কাব্যকে নিয়ে যাবে দূর সমুদ্রে, জয় করবেন তিনি নতুন কল্পনার উপনিবেশ, বাঙলা কাব্যকে দিগন্তবিহারিণী করবেন ঢেউয়ের ধাক্কায় আর ঝড়ের কাপটায়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-চিহ্নমাত্র নেই এমন কবি আজ একজন যখন দেখা গেছে, ক্রমে-ক্রমে আরো দেখা যাবে নিশ্চয়ই—তাঁদের ভাব ও ভঙ্গি, বিষয়বস্তু ও দৃষ্টি সবই হবে অন্যরকমের। আর এইদিকেই যদি পরিণতি হয় (এবং মনে হচ্ছে যে তা-ই হবে) তাহ'লে বাঙলা কাব্যে সম্পূর্ণ এক নতুন দিন বেশি আর দূরে নয়। বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব বড়ো আশা হচ্ছে।

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : প্রেমেন্দ্র মিত্র : সহকারী সম্পাদক : সমর সেন
৫ ও ৬ চিন্তামণি দাস লেন মৌলালি প্রেস হইতে প্রভাতচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"রমণীর সৌন্দর্য্য
তাহার নিজের হাতে"

তবু এমন অনেক মেয়ে আছেন যাঁরা সৌন্দর্য্যের সমাদরে কি সাধনায় অবহেলা করেন, অথচ ভালোবাসা ও পারিবারিক সুখশান্তিতে সৌন্দর্য্যের মূল্য যে কত তা বলা যায় না।

একটু যত্ন নিলে সহজেই সুন্দর হওয়া যায়, আর সুন্দর হওয়া মানেই ভালোবাসা পাওয়া

রোজ রাত্রে পাঁচ মিনিট ওটিন ক্রীম দিয়ে মুখ, গলা ও কাঁধ রগড়াবেন, তাতে ক্লান্ত ত্বক্ উজ্জীবিত ও পরিপুষ্ট হবে তা ছাড়া, সূক্ষ্ম লোমকূপ পরিষ্কার হবে, যেখানে সাবান জলও প্রবেশ করতে পারে না। ওটিন ক্রীম মাখলে আপনার হাত দু'খানা হবে শুভ্র কোমল ও সুন্দর, আর নখ এমন ঝকঝকে হবে যেমন আর কিছুতেই হবে না।

দিনের বেলায় ওটিন স্নো ব্যবহার করবেন। রোদ, হাওয়া, ধুলো ও ঘাম আপনার চামড়ার যা ক্ষতি করে, তা থেকে ওটিন স্নো আপনাকে রক্ষা করবে।

ওটিন ক্রীম—রাত্রে নিয়মিত ব্যবহার্য্য

ওটিন স্নো—দিনের আলোর স্নিগ্ধ বিলীয়মান ক্রীম

সুখের সংসার নিজের হাতেই গড়তে হয়

কোনো কোনো সংসার নিরানন্দ—যেন সেখানে প্রাণ নেই। কোনো সংসার আবার হাসি-খুশী আনন্দে উজ্জ্বল। আনন্দের সংসার মেয়েরাই গড়ে তোলে।

যে বধূ স্ত্রী স্বামীর পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আনন্দময় করে তুলতে চায় সে বাড়ীতে আমন্ত্রণ করে এমন লোক যাদের সংসর্গ তার স্বামীর ভালো লাগে। সবচেয়ে ভালো নিমন্ত্রণ হচ্ছে চায়ের নিমন্ত্রণ। তৃপ্তিকর এক পেয়ালা ভালো চা সামনে থাকলে আলাপ জমে ওঠে; বাড়ীতে হৃদ্যতা ও অন্তরঙ্গতার হাওয়া বয়। এই আনন্দের পাত্রই প্রতিদিন নতুন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটায়। বাড়ীতে যদি চায়ের মজলিস্ না থাকে, আজ থেকেই তা সুরু করুন।

চা প্রস্তুত-প্রণালী

টাট্‌কা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটা মাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

দশজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—ভারতীয় চা